Min Piyasi

By Subodh Ghosh

Price Rs. 4·00

ক্লাসিক প্রেস

বড়দা আছেন গ্লাসগোতে; মেজদা পশ্চিম বার্লিনে; আর, যে সেজদা এতদিন কলকাতাতেই ছিলেন, তিনিও এইবার চললেন। কলকাতার বাইরে তো বটেই, দেশেরই বাইরে। ইন্দোনেশিয়ার জাকর্তাতে; এক সিন্ধী সদাগরের কারবারী ইচ্ছা ও চেষ্টার উপদেষ্টা হয়ে।

—শেষে তুমিও চললে সেজদা? এবার যে বাড়িটা সত্যিই খালি হয়ে গেল।

অভিযোগের সুরে কথাগুলি বলে তপতী। বলতে গিয়ে চোখ দুটোও ছলছল করে ওঠে। এত বড় বাড়িতে এবার শুধু একা পড়ে থাকবে তপতী।

প্রতিবেশী হরেন বাবু তখন সামনেই ছিলেন। তিনিও শুনে সুখী হতে পারেননি যে, বিমলও শেষে দেশ ছেড়ে ইন্দোনেশিয়াতে চললো। বিমল একা নয়, স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছে। সুতরাং, বাড়িটা শূন্যই হয়ে গেল। হরেন বাবুর দুঃখ এই যে, তাঁরই স্বর্গত বন্ধু ভবতোষ মল্লিকের সংসারটাই এইবার শূন্য হয়ে গেল। অথচ, হরেন বাবু আজও ভুলতে পারেননি, এবং সে-সব দিনের স্মৃতি আজও তাঁর মনের ভিতরে মাঝে মাঝে যেন সে-দিনেরই ভাষায় কথা বলে ওঠে। সে-সবদিনের হাসির তুফান, তর্কের সোরগোল আর যত সাধের আলোচনা ও পরামর্শের শব্দগুলিকেও যেন শুনতে পান। মনে হয়, এই তো সেদিন ভবতোষ কত খুশি হয়ে একটা কল্পনার আনন্দকে ব্যাখ্যা করে করে বুঝিয়েছিল, আমার নতুন বাড়িতে সব শুদ্ধ বারটি ঘর থাকবে হরেন। সেইভাবে প্ল্যান করেছি। তিন ছেলের প্রত্যেকের

জন্য দুটি করে ঘর, অর্থাৎ ছয়টি ঘর। তা ছাড়া, আমার জন্যে দুটি, তপতীর মার জন্যে দুটি, আর তপতীর জন্যে দুটি—এই আরও ছয়টি, সব নিয়ে হলো বারটি।

হরেন বাবু যেন পনর বছর আগের নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পান।

—তা হলে তো ভালই হয় ভবতোষ। ছেলেরা বড় হবে, বিবাহিত হবে, তাদের ছেলেপিলেও হবে। দুটি করে ঘর তো দরকারই হবে। কিন্তু তোমরা কর্ত্তা-গিন্নী কেন মিছিমিছি দুটি করে ঘর।......

—তুমি আমার আসল প্ল্যানটা ধরতেই পারনি হরেন। আমরা কর্ত্তা-গিন্নী দু'জনে তো নিতান্ত টেম্পোরারি। মেয়াদ বড় জোর আর পনর বছর; তারই মধ্যে একদিন ভবপারে পাড়ি দিতে হবে। আর তপতীটাও তো বলতে গেলে টেম্পো-রারি। ওর বিয়ে হয়ে যাবে, পরের ঘরে চলে যেতে হবে। সুতরাং, এই যে ছটা ঘর বেঁচে যাবে, সেগুলি তিন ভাইয়েরই দরকারে লেগে যাবে। আমার আসল প্ল্যান হলো, তিন ছেলের প্রত্যেকের জন্যে চারটি করে ঘর।

হরেন বাবু হাসেন—তাই বল।

ভবতোষ বাবুর প্রৌঢ় চক্ষু দুটি মোটা গ্লাসের চশমার আড়ালে যেন একটা তৃপ্তির সুরে জ্বলজ্বল করে; যেন তাঁর প্ল্যানের এই বাড়িটার একটা সুন্দর কলমুখর জীবনের ছবি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। —বুঝতেই তো পারছো হরেন; নাতিপুতির ভিড় যেদিন বাড়বে, সেদিন মাত্র দু'টি ক'রে ঘরের মধ্যে বেচারাদের সংসার ধরবে কেমন ক'রে?

ভবতোষ বাবু আর হরেনবাবু, দুই বন্ধুতে যখন পরামর্শ ক'রে এই সার্কাস অ্যাভেনিউ-এর এই দিকে বাড়ি করবার জন্য প্ল্যান

করেছিলেন, তখন কলকাতার সহুরে সোরগোল একটু দূরে ছিল। এবং সেই জন্যেই জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল। বেশ হবে, সহুরে সুবিধাগুলির সবই পাওয়া যাবে, অথচ বাজার-বাজার নোংরামিটা থাকবে না। পাখির ডাক শোনা যাবে; শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঘরে বসে ডোবার ব্যাঙের ডাকও শোনা যাবে; আর তাকালেই চোখে পড়বে, খেঁজুর আর সুপুরির জংলা মাথার ভিতর জোনাকীর দল ঝিকমিক করছে।

যেমন প্ল্যান করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই বাড়ি করা হয়েছিল। সে দুই বাড়ি এখনও আছে। আগে হরেনবাবুর বাড়ি, তার কিছুদিন পরে ভবতোষবাবুর বাড়ি। ভবতোষ মল্লিকের বাড়ি থেকে হরেন বসুর বাড়ি, মাঝে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথের ব্যবধান।

হরেনবাবুর বাড়িতে একা হরেনবাবুই হলেন বাড়ির মানুষ। তিনি শুধু একটি ঘর নিয়ে থাকেন। আর পাঁচটি ঘরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা হলেন ভাড়াটিয়া। পাঁচটি ঘরে পাঁচটি পরিবার। তাঁদের মধ্যে দুটি পরিবার হলো শুধু স্বামী-স্ত্রী। বাকি তিনটি পরিবারে স্বামী স্ত্রী ছাড়া তিন-চারটি করে ছেলেমেয়েও আছে। সুতরাং, হরেনবাবুর বাড়ি' একটি জনভারপীড়িত বাড়ি। রাত দুটোর সময়েও স্বামী-স্ত্রীর কলহ আর ছেলে মেয়ের চীৎকারের শব্দ শোনা যায়। লোকে বলে, বেচারা হরেনবাবুর শান্তি নেই।

কিন্তু হরেনবাবু নিজে কখনও এই ধরনের আক্ষেপ করেছেন কিনা সন্দেহ! বরং, দেখে মনে হয় যে, তিনি এই রকমটিই পছন্দ করেন। তা না হলে—এই তো সেদিনও, ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীর ডেলিভারির সময় তিনি নিজে এই বুড়ো বয়সে ছুটোছুটি করে ডাক্তার আর নার্স ডাকাডাকি করলেন কেন? সারা রাত জেগে বসে রইলেনই বা কেন? তারপর, ভোর বেলায় বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে নবজাত শিশুর কান্নার

শব্দ শুনে ছেলেমানুষী উল্লাসের মত অমন করে ছটফটিয়ে হেসে উঠলেনই বা কেন? আর নারায়ণ নারায়ণ বলে ওভাবে চেঁচিয়ে নাম জপতে জপতে একেবারে ক্ষেত্রবাবুর ঘরের দরজার কাছেই বা গিয়ে দাঁড়ালেন কেন?

কিন্তু বন্ধু ভবতোষের বাড়িটা এভাবে শূন্য হয়ে যাচ্ছে কেন? সব থাকতেও শূন্য! তিন ছেলে আর এক মেয়ে থাকতেও এত বড় বাড়িটা খা-খা করবে, এমন ভবিষ্যৎ কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি ভবতোষ। বরং যা কল্পনা করেছিল ভবতোষ, ঠিক তার উল্টোটি হয়েছে। অমল আর শ্যামল তো আগেই সরেছে, এবার বিমলটাও চললো। ছিঃ, ভবতোষ বেচারার আত্মাটা যে কেঁদে ফেলবে।

বড় ছেলে অমল আছে গ্লাসগো'তে। সে আর ফিরবে বলে মনে হয় না। একটা বিখ্যাত কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, মাইনেও ভাল পায়। তা ছাড়া গ্লাসগোতেই একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে অমল। ছেলেপুলেও হয়েছে। এখন বলতে গেলে গ্লাসগোই হলো অমলের আপন-দেশ।

পশ্চিম বার্লিনে একটা হাসপাতালের সার্জন হয়ে শ্যামলের জীবনটাও বোধ হয় জার্মান হয়ে গিয়েছে। তা না হলে দেশে আসে না কেন? শ্যামলটা তো বিয়ে করেনি। কিন্তু···সে সব খবরেরও কিছু কিছু শুনেছেন হরেন বাবু। শ্যামলের মতিগতি ভাল নয়। শ্যামল নাকি বিবাহিতা এক মার্কিন মহিলার খুবই স্নেহের আস্পদ হয়ে উঠেছে। সেই মহিলার ইচ্ছায় আর ইঙ্গিতে ওঠে বসে শ্যামল। সে-মহিলা একেবারেই পছন্দ করে না যে, শ্যামল দেশে ফিরে যাক্। বিমলের কাছে লেখা একটা চিঠিতে শ্যামল এমন কথাও জানিয়েছে যে, বোধ হয় আমেরিকায় চলে যেতে হবে; আর শেষ পর্যন্ত আমেরিকারই নাগরিক হতে

হবে। শ্যামলের বেনিফ্যাক্‌ট্রেস সেই মার্কিন মহিলা বলেছেন, তিনিই চেষ্টা করে শ্যামলকে মার্কিন নাগরিক করিয়ে দিতে পারবেন।

বিমল তবু একটু দেশী জীবন সঙ্গে নিয়েই বিদেশে চলেছে। সরসীও সঙ্গে যাচ্ছে। তবু ভয় হয়, কে জানে হয়তো বড়বুহুর টুহুর দেখে মুগ্ধ হয়ে বিমলও জাকর্তায় নাগরিক হয়ে সে-দেশেই থেকে যাবে। হরেন বাবুর ভীরু মনটা মাঝে মাঝে যেন বেশ রাগ করে তপ্ত হয়েও ওঠে। কারণ তাঁরও একটা আশা ভেঙ্গে যেতে বসেছে।

বিমলের স্ত্রী এই সরসী; যার মুখের মত সুন্দর ধাঁচের মুখ এই দুনিয়াতে কোথাও আছে বলে মনে করেন না হরেন বাবু, সেই সরসীকে আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে একদিন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর, বোধ হয় একটি দিনও হরেন বাবুর চিন্তা ও চেষ্টা কোন বিশ্রাম পায়নি। সার্কাস অ্যাভিনিউ থেকে আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট—তিনটি মাস দৌড়াদৌড়ি করে সরসীর সঙ্গে বিমলের বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করেই ফেললেন। একদিন স্বপ্নও দেখেছিলেন, ভবতোষ বলছে, আমার কোন চিন্তা নেই হরেন, তুমি যখন আছ, তখন বিমলের বিয়ে দেবার সব দায় তোমারই। অমল আর শ্যামল, বড়ই দাগা দিয়েছে হরেন। এখন বিমলটা যদি…।

হ্যাঁ, যেন ভবতোষের এত বড় বাড়িটার শূন্যতার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবাব জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরেন বাবু। বার বার মনেও পড়েছিল, মারা যাবার আগের দিন তপতীর মা হরেন বাবুকে যে-কথাগুলি বলেছিল।—উনি নেই, আমিও চললাম। ওদের কে দেখবে আপনি ছাড়া?

কেঁদে ফেলেছিলেন হরেন বাবু—আমি যতদিন আছি ততদিন নিশ্চয় দেখবো।

তপতীর মা বেচারীও এমন ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেননি যে, তিন ছেলে থাকতে এত বড় বাড়িটা একদিন শূন্য হয়ে যাবে। বেচারী বেঁচে নেই, সেটাও বোধহয় একরকমের বাঁচোয়া। অমল আর শ্যামলের দেশ-ছাড়া জীবন, তা ছাড়া ওসব মতিগতির কাণ্ড ঘটে যাবার আগেই মা বেচারী চলে গিয়েছে। ভালই হয়েছে, অনেক আক্ষেপের যন্ত্রণা থেকে বেঁচে গিয়েছে।

কিন্তু,···হ্যাঁ, ঠিকই, বিমলের বিয়ের দিনে বার বার তপতীর মার কথাটাই মনে পড়েছিল হরেন বাবুর। সরসীকে, বিমলের বউকে দেখে কত খুশি হতেন তিনি, সে-কথা ভাবতে গিয়ে হরেন বাবুর চোখে জল এসেছিল। বউ বরণ করে ঘরে তোলবার জন্যে বাড়িতে মেয়েদের হুড়োহুড়ি পড়েছে, শাঁখ বাজছে; শানাইয়ের আওয়াজও বাতাস মিঠে করে তুলেছে। চাদরের খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে হরেন বাবু সেদিন হেসে হেসে সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর শান্ত সড়কের উপর মাঝরাত পর্যন্ত বেড়াতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তপতীর মা'র অনুরোধের সম্মানটা রাখতে পেরেছেন তিনি, বিমলের বিয়ে দিতে পেরেছেন। এইবার এই বাড়িতে একটু হাসাহাসি আর চেঁচামেচি, একটা নতুন কলরবও জেগে উঠবে বৈকি।

ঠিকই, খবরটা জানতে পেরে হরেন বাবুর প্রাণ একদিন আহ্লাদে প্রায় আটখানা হয়ে গিয়েছিল। আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের চিঠি পেলেন, সরসীর বাবা জানিয়েছেন, সরসী অন্তঃসত্ত্বা। লেডি ডাফরিনের রিপোর্ট, এই মাত্র তিন মাস। কাজেই আর ছয়-সাত মাস পরেই···হ্যাঁ, সরসীকে এখন আমার এখানেই রাখতে চাই, মেয়েটার প্রথম সন্তান, একটু ভয়ও হচ্ছে, হরেন বাবু। একটু বিশেষ যত্ন চাই। বাপের বাড়ি যত্নে মেয়েটার মনের ভয়ও···।

না, না, না, কখনই তা হতে পারে না। মাপ করবেন

কেষ্টবাবু; বৌমাকে এখন আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়িতে রাখা সম্ভব হবে না। ভবতোষের নাতি ভবতোষের বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হোক্। এখানেও সরসীর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আপনি জেনে রাখুন, বাপের বাড়ির তুলনায় সরসী এখানে বেশি আদর-যত্ন পাবে। আপনি এমন ধারণার গর্ব ছেড়ে দিন যে, আপনি মেয়ের-বাপ বলেই মেয়েকে আদর-যত্ন করতে জানেন, আর আমরা…।

আরও অনেক কড়া কথা হয়তো লিখে ফেলতেন হরেন বাবু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগ সামলে নিয়ে শান্ত ভাষাতেই লিখলেন, বিমলের ছেলে আপনার ওখানে ভূমিষ্ঠ হবে, এটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু হরেন বাবুর এত বড় গর্বের রাগটাও যে জব্দ হয়ে গেল। সরসীও চললো জাকর্তায়। দেখে বোঝা যায়, সরসীরও একটুও আপত্তি নেই। হরেন বাবুর আশাভঙ্গ মনের বেদনাকে যেন আরও ব্যথিত করে একটা আশঙ্কার প্রশ্ন বিদ্রূপ হানছে। বিমলও কি আর দেশে ফিরে আসবে? বিমলের ছেলে, বন্ধু ভবতোষের নাতিটিও কি শেষে জাভানীজ হয়ে যাবে না?

বাকী আছে শুধু তপতী। ওটা যাবে কবে? গেলেই তো হয়। ভবতোষের বাড়িটা আরও ভাল করে শূন্য হয়ে খা-খা করুক। আর গবর্ণমেণ্ট একদিন বাড়িটাকে রিকুইজিশন করে আমেরিকার গমের গুদাম করে দিক। সব ল্যাঠা চুকে যাক্।

হরেন বাবুর মনে এমন ভয়ও যে দেখা দেয়নি তা নয়। বিমল জাকর্তায় চলে যাবে শুনে হরেন বাবু এবাড়িতে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তারপর একদিন না এসে পারলেন না। কারণ, এইবার একটা চিন্তা, তপতীর কি হবে? ভাইগুলো তো এক একটা পাগল; বোনটার কোন গতি হলো কি না হলো সেদিকে কোন হুঁসই নেই।

এয়ার সার্ভিসের গাড়ি বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সরসী

কাঁদছে। বিমল গম্ভীর। হরেন বাবু বিষণ্ণ। তপতীর মুখের কথাগুলি শুধু করুণ হয়ে বাজছে—বাড়িটা যে খালি হয়ে গেল।

এখনি রওনা হতে হবে। হাতঘড়ির দিকে ব্যস্তভাবে তাকায় বিমল। তারপরেই তপতীর মাথায় হাত বুলিয়ে বিমল বলে—তুই বিয়ে কর তপতী।

বিদায়ের ঘটনাটা এরপর নিঃশব্দেই সম্পন্ন হয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। বোধ হয় কারও মনের ভিতরেও আর কোন কথা নেই। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই।

এয়ার সার্ভিসের গাড়ীটাও কখন চলে গেল, বুঝতে পারেনি তপতী, বুঝতে পারেনি হরেন বাবুও। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। আর, বোধ হয় এই অভিশপ্ত নীরবতার আঘাত সহ্য করতে না পেরে হরেনবাবু শেষে চেঁচিয়ে ওঠেন—এবার তোমার বিয়েটা হয়ে যাক্ তপতী। ঠিকই বলেছে বিমল।

তপতীরও ইচ্ছে বিয়েটা হয়ে যাক্ ; কিন্তু মাঝে মাঝে আশ্চর্য না হয়ে, আর বেশ লজ্জিত না হয়েও পারেনা তপতী। এই ইচ্ছেটার বয়স যে প্রায় উনিশ-কুড়ি হলো। তবু ইচ্ছেটা যেন আজও লজ্জা পায় না। আরও আশ্চর্য, রাগও করে না, হতাশও হয়ে যায় না।

আজ না হয় বয়সটা ত্রিশ পার হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু বিয়ের কথা ওঠেই না, এমন বয়স যখন ছিল, তখনই বা কী কাণ্ড করেছিল তপতী ?

মা বেঁচে ছিলেন তখন, আর বড় মাসী এসেছিলেন নীরুদির বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে ; কথায় কথায় বলেছিলেন, আমি কিন্তু তোমার তপতীর জন্যে একটি পাত্র ঠিক করে রেখেছি জয়া। আর একটু বড় হোক্, তারপর একদিন···।

সে পাত্রের রূপ গুণের বর্ণনাও করেছিলেন বড় মাসী। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দশ বছর বয়সের তপতী সব কথা শুনেছিল। শুনতে শুনতে বোধ হয় মুগ্ধও হয়ে গিয়েছিল। বড় ভাল ছেলে। নামটি হলো সমীরণ। এই বছর কলেজে ঢুকেছে। লেখাপড়ায় চমৎকার। স্বাস্থ্যটিও ভাল। মুখটি একেবারে ফুটফুটে ফুলটি।

বড় মাসী চলে যাবার পর সেদিনই তপতী হঠাৎ খেলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে এসে মাকে প্রশ্ন করেছিল—ফুটফুটে মানে কি মা?

—খুব সুন্দর।

শুধু সেদিন নয়, সেদিনের প্রায় একটা বছর পরে, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে মা'র আঁচল চেপে ধরেছিল তপতী—কই, আমার বিয়ে তো হলো না? আমি তো বড় হয়েছি।

হেসে ফেলেছিলেন জয়া—বিয়ে হবার কথা ছিল নাকি?

—ছিল না তো কি? বড় মাসী যে সেদিন বলে গেলেন।

—কি বলে গেলেন?

—মুখটি যেন ফুটফুটে ফুলটি, একজন ছেলে আছে, কলেজে পড়ে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

জয়া আরও আশ্চর্য হয়ে হাসতে থাকেন—কী কাণ্ড! কবে বড়দি এসে একটা গল্প করে গেলেন, সেটা এখনও মনে করে রেখেছে মেয়েটা!

তপতীর মুখটা যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়।—গল্প?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, গল্প। অমন কত গল্প হবে। তারপর বিয়ে হবে।

চুপ করে মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তপতী। এগার বছর বয়সের প্রাণটা যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়েছে। মুখটা বোবা হয়ে গিয়েছে। চোখ দুটো বোকা হয়ে গিয়েছে। একটা আহত বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে চোখের দৃষ্টিটাও কাঁপতে থাকে, যেন

এক বছর ধরে মনের ভেতরে পুষে রাখা একটা রূপকথার আবেশ হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। বড়মাসীর সেদিনের কথাগুলি নেহাতই গল্প। তার মানে মিথ্যে। আকাশের চাঁদের হাসিটাসি সবই তাহলে গল্প! 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', এই যে কিছুক্ষণ আগে মাষ্টার মশাই গানটাকে কী সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, সে-সবও তাহলে গল্প! মিথ্যে! নতুন আলো হাতে নিয়ে শরৎ-কালটা সত্যি অঞ্জলি দেয় না, দিতে পারে না। শরৎকালের তো সত্যি দুটো হাত নেই। ওগুলো শুধু গল্প, শুধু মিথ্যে।

মায়ের মুখের সেই আশ্চর্যের হাসির ছবিটা এখনও চেষ্টা করলে মনে পড়ে বৈকি, ছবিটা যদিও একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মনে পড়লে আজও তপতীর বুকের ভিতরটা যেন লজ্জা পেয়ে কেঁপে ওঠে। সে লজ্জার মধ্যে বোধ হয় ছোট্ট একটা কাঁটার মুখও লুকিয়ে আছে, যে জন্যে পুরানো দিনের কথা ভাবতে গেলে আজকের এত কঠোর সতর্ক মনটার গায়েও বেশ একটা খোঁচা লাগে।

মা যতদিন বেঁচেছিলেন, তপতীর জীবনে এমন আরও অনেক গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। সে-সব গল্পের অনেক কথা ভুলে গেলেও অনেক কথা আবার এখনও স্পষ্ট করে মনে করতে পারা যায়। এমন বছর যায়নি; বছর কেন, বোধ হয় এমন একটা মাসও পার হয়নি, তপতীর বিয়ের কথা নিয়ে বাড়ীতে আলোচনা না হয়েছে। বাড়িতে এমন কোন মহিলা মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসেননি, যিনি কথায় কথায় তপতীর বিয়ের কথা তুলে দুচারটে উপদেশ না দিয়ে চলে গেছেন।

খুব ভাল হয়, বলেছিলেন এক হাসি খুশি মোটা-সোটা চেহারার মহিলা, যদি একটি খুব ভাল শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হয়। অন্তত ডবল এম-এ, এমন একটি ছেলে না হলে তপতীর মত মেয়ের সঙ্গে মানাবে কেন? লেখা-পড়া এত ভালবাসে যে মেয়ে,

সে মেয়েকে সামান্য শিক্ষিত একটা পাত্রের হাতে তুলে দিলে ভুল হবে জয়া, সে পাত্রের বাড়ি-গাড়ি যতই থাকুক না কেন!

সে মহিলা পাঁচ মিনিট পর-পর পান খেতেন; তারপরই এক মুঠো দোক্তা। মনে পড়ে, এই বারান্দারই উপরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সেই মহিলা। তারপর সারা বাড়িতে আতংক আর উদ্বেগের কী ভয়ানক ছুটোছুটি; সে দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দু'জন ডাক্তার এলেন; মহিলার মাথায় বরফের ব্যাগ চেপে ধরে সেজদা তিন ঘণ্টা বসে রইলেন। শেষে মহিলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গলো। এবং বিছানার উপরে গড়ানো শরীরটাকে এপাশ-ওপাশ করে, তারপর একটা গা-মোড়া দিয়েই মহিলা কথা বললেন—তপতী ম্যাট্রিকটা পাশ করবে কবে? আর কতদিন বাকি আছে?

মা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—আপনি চুপ করে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। তপতীর কথা ভেবে এখন কোন চিন্তা করবেন না।

—চিন্তে করবো কেন? চিন্তের কিছু নেই। আমার রমেশ এবারেই এম-এ দেবে। ওঁরও ইচ্ছে…।

মা আরও ব্যস্ত হয়ে বলেন—আপনি এখন বেশি কথা বলবেন না।

—ওঁর ইচ্ছে, রমেশকে অন্তত তিনটে এম-এ পাশ না করিয়ে বিয়ে টিয়ের কথা মুখেই তুলবেন না। কিন্তু আমি বলেছি, দুটো এম-এ যথেষ্ট। ততদিনে তপতীও বোধহয়…।

মা হেসে ফেলেন—তপতী ততদিনে ম্যাট্রিক পাশ করে ফেলবে।

—বেশ, তাহলে কথা রইল, তুমি তপতীর জন্যে আর কোন চিন্তে করবে না। তপতী আজ থেকে আমারই ঘরের হয়ে গেল।

মা বলেন—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু বোধহয় ছটা মাসও পার হয়নি, আজও মনে করতে পারে

তপতী, যাদবপুরের পিসিমার জা একদিন এসেছিলেন। মা বললেন—কী নয়নতারা? তুমি কি রাস্তা ভুল করে হঠাৎ এদিকে···।

পিসিমার জা নয়নতারার মুখটাও মনে পড়ে, বয়সটাও। নয়নতারার সেই বয়সটা তপতীর আজকের বয়সের চেয়ে বরং একটু ছোটই হবে, বড় কিছুতেই নয়। ঝকঝকে একটা জর্জেট পরে, ডবল বিনুনী দুলিয়ে, আর চশমা পরা দুই চোখেও কাজল বুলিয়ে নয়নতারার সুন্দর চেহারাটা কিরকম একটু অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, সে দৃশ্যটাও তপতীর স্মৃতি হতে আজও একেবারে মুছে যায় নি।

নয়নতারা রুমাল দিয়ে গলার পাউডার মুছতে মুছতে একবার তপতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তার পরেই হেসে ফেলেছিল। —গরজ বড় বালাই, জয়াদি। রাস্তা ভুল না করে উপায় কি?

মা আশ্চর্য হন—গরজ।

—গরজ বৈকি। ঠাকুরপো যে প্রায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন।

—তোমার ঠাকুরপো? তার মানে চঞ্চল?

—হ্যাঁ।

—চঞ্চল আজকাল কি করছে?

—একটা ব্যাঙ্কে কাজ নিয়েছে, আর···।

—আর কি?

—আর কবিতা লিখছে।

—ভাল কথা।

—একটু বিপদেরও কথা জয়াদি।

—কেন?

—কবিতাগুলো যে তপতীর জন্যে যত ধ্যানের স্তোত্র। তিনটে খাতা ভরে গিয়েছে।

—এ কী কাণ্ড।

—হ্যাঁ, কাণ্ডই বটে, তপতীকে বিয়ে করতে চায় চঞ্চল। কে জানে কবে, ভাল করে মুখ খুলে বলেও না, কবে যেন তপতীকে আপনাদের এবাড়ির বাগানে একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ; বাস্, তারপর থেকেই···।

—তা, ওরকম একটা ভাব যদি হয়েই থাকে···এমন দোষের কিছু নয় নিশ্চয়···তবে, কথা হলো ··।

—আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে ?

—কোন আপত্তি নেই। তপতীও কবিতা খুব ভালবাসে। তুমি বরং একটু পরীক্ষা করেই দেখ ; কথা ও কাহিনীর সব কবিতা এখনই আবৃত্তি করে তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারবে মেয়েটা।

—আঃ, নিশ্চিন্ত হলাম জয়াদি, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো···আগে আপনাকে একটা প্রণাম করে নিই।

বলতে বলতে ঢিপ করে জয়াকে প্রণাম করেই একটা হাঁপ ছাড়ে নয়নতারা। —ওঃ, এই তিনটে মাস ধরে ঠাকুরপোকে বোঝাতে গিয়ে যে কী হয়রানি ভুগতে হয়েছে, তা ভগবান জানেন। কতবার বলেছি, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, একটু ধৈর্য ধরুন, তারপর যদি মনে হয় যে···কিন্তু—না, কবির মন আর ধৈর্য ধরতে রাজি নয়। উনিও বললেন, যাও তবে, তপতীর মা'র কাছে গিয়ে কথাটা পেড়েই ফেল। কাজেই···।

—খুব ভাল করেছ। শুধু একটা কথা ; তপতী ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে নিলে কি ভাল হয় না ?

—সেই তো সব চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু···।

—যাক গে তবে। চঞ্চলের মত ছেলে, চেনা-শোনার মধ্যে এর চেয়ে ভাল ছেলে পাওয়াই বা যাবে কোথায়, জানি না। আমার একটুও আপত্তি নেই নয়নতারা।

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে মা আর নয়নতারার যত সহাস্য দাবী

আর সহাস্য সম্মতির মুখরতাগুলি চুপ করে শুনছিল তপতী। আবার একটা গল্পের আবির্ভাব; শুনতে বেশ লাগে। রূপকথার মত সুন্দর মিথ্যে শোনবার আনন্দ!

কিন্তু নয়নতারা বোধ হয় তপতীর এই শান্ত মূর্তিটাকে সহ্য করতে রাজি নয়। তপতীর দিকে এগিয়ে এসে কলকল করে হেসে ওঠে নয়নতারা—যাদবপুরেও বকুল গাছ আছে তপতী। কোন চিন্তে করো না।

যেন একটা বিস্মিত ভয় হঠাৎ হতভম্ব হয়ে করুণ লজ্জার মত তপতীর চোখে-মুখে ছমছম করতে থাকে। রূপকথার আবেশটা যে সত্যিই নিবিড় হয়ে বুকের ভিতরের যত নিঃশ্বাসের টিপটিপ শব্দগুলিকে একেবারে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। সত্যিই যে একদিন বাগানের পূবদিকের বকুলগাছটার ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে গুণগুণ করে গান গেয়েছিল তপতী। কে জানে কখন আড়াল থেকে তপতীর সুন্দর মুখের রূপ দেখে কিংবা বিমনা প্রাণের গুঞ্জন শুনে ঠিক গন্ধচোরা বাতাসের মত উতলা হয়ে চলে গেল নয়নতারা মাসির কবি ঠাকুরপো? নেহাৎ গল্প বলে তো মনে হচ্ছে না। সত্যিই যে তপতীর নামে এই পৃথিবীতে এক জায়গায় অজস্র কবিতার ফুল ফুটেছে।

যাবার সময় তপতীর একটি ফটো নিয়ে গেল নয়নতারা। আর, তপতীর সামনেই অনায়াসে চেঁচিয়ে বলে দিতেও নয়নতারার একটুও বাধলো না—যাই, আপাতত এই দিয়ে কবিকে শান্ত করি। আর ওঁকেও বলবো, যেন এই মাসের মধ্যেই একদিন এসে একটা ভাল দিন ঠিক করে যান…! আমি তাহলে… তাহলে এই কথা একেবারে পাকা কথা হয়ে রইল জয়াদি।

—হ্যাঁ এসো। হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি। জয়াও এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে জবাব দিলেন। চলে গেল নয়নতারা।

কিন্তু আজ আর মনে করতে পারে না তপতী, কেন আর কিসের জন্যে গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে পারেনি। ডবল এম-এ রমেশ কোথায় গেল? নয়নতারা মাসির কবি ঠাকুরপোর কি হলো? শেষ পর্যন্ত কোথায় যে তারা লুকিয়ে পড়লো, সে খবর হয় তো মা জানতেন; কিন্তু মনেও তো পড়ে না, সে-জন্যে মাকে কোনদিন কোন আক্ষেপ করতে শুনতে পেয়েছিল তপতী। এক একটা উৎসবের আয়োজন যেন কথায় কথায় পাকাপাকি হয়ে যায়, তারপর দেখা যায় আর বেশ বোঝাও যায় যে, উৎসব নয়, উৎসবের নামে কতকগুলি মিথ্যে ব্যস্ততার কথা যেন হঠাৎ হাসাহাসি করেছে, তার পরেই চিরকালের মত নীরব হয়ে গিয়েছে।

একজন ডবল এম-এ মানুষ; ভাবতে খারাপ লাগেনি সেদিনের সেই তপতীর। বরং বার বার মনে পড়েছিল আর ভাবতে হয়েছিল, নিশ্চয় খুব ভাল-ভাল কথা, খুব চমৎকার কথা বলতে পারবে আর তপতীকে বার বার আশ্চর্য করে দেবে মানুষটি। এখনই যে শুনতে ইচ্ছে করে সে-সব চমৎকার কথা।

কিন্তু সে ইচ্ছের মায়া যেন চমকে দিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে খাতা-ভরা কবিতা গুণগুণ করে উঠলো। আরও ভাল করে শুনতে ইচ্ছে করে, কী বলতে চায় এই অদ্ভুত গুঞ্জন? দেখতেও ইচ্ছে করে, সত্যিই কী লিখেছে কবি মানুষটা। পড়ার বই সামনে খোলা রেখে আনমনার মত এমন কথাও ভাবতে হয়েছে, ভাল ভাল আর চমৎকার বিদ্যার কথার চেয়ে কবিতার কথাই বোধহয় শুনতে বেশি ভাল লাগবে। ম্যাট্রিক পাশ করতে দেরি আছে, হোক না কেন দেরি; কিন্তু সেজন্যে বিয়ে হতে দেরি হবে কেন? মা'র ইচ্ছের চেয়ে নয়নতারা মাসির ইচ্ছেটাই বেশি ভাল। ম্যাট্রিকটা একটু দেরিতে হলেই ভাল। চঞ্চলের কবিতার খাতাটা এখনি দেখতে ইচ্ছে করে, একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করে না।

আজ ভাবতে গিয়ে তপতীর একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি। সেদিনের সে ইচ্ছার কোন অর্থ না বুঝেও ইচ্ছাটাকে কত ভাল লেগেছিল। সেই ভাল লাগা অনুভবের নেশা বুঝি এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তা না হলে আজও হরেন কাকার অনুরোধের কথা শুনে মনের ভিতরে হঠাৎ একটা দোলা লাগে কেন? যেন একটা হঠাৎ উতলা বাতাসের দাবি এসে বুকের ভেতরে একটা গোপন নিরালার উপরে এক গাদা বকুল-কুঁড়ি ঝরিয়ে দিতে চায়। বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করতেই তো চায় তপতী।

কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই বোধ হয় একটা অকরুণ বিদ্রূপ আড়াল থেকে তপতীর জীবনটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। যে ইচ্ছার উপর জীবনে কোনদিন সামান্য একটু রূঢ় হতে পারেনি তপতী, সেই ইচ্ছাটাই যেন তপতীর আশাকে বার বার জব্দ করেছে। আজও বিয়ে হয়নি তপতীর; বিয়ে করতেই পারেনি।

বাবা চলে গিয়েছেন, তপতীর বিয়ের নামে অনেক কল্পনা আর সাধের কথা শুধু বলে বলে; মা চলে গিয়েছেন অনেক আক্ষেপ ক'রে; ভগবান যখন এত সৌভাগ্য দিলেন, তখন অন্তত মেয়েটার বিয়ের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সুযোগটাও যদি দিতেন। কিন্তু দিলেন না; কে জানে তপতীর কপালে কী আছে?

দাদারাও কয়েকবার চেষ্টা করেছিল।—তুই নিজেই বুঝে শুনে এবার বিয়ে কর তপতী; শুধু এই অনুরোধটাই ছিল দাদাদের চেষ্টা। তার বেশি কোন চেষ্টা করবারই সুযোগ পায়নি অমল কিংবা শ্যামল; আর এই বিমলও।

তপতীও মুখ খুলে বলে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি—এত ভয় করছো কেন? না বুঝে-শুনে বিয়ে করবার হলে কবেই তো করে ফেলতাম।

তিন দাদা ও ছোট বোন হাসাহাসি আর ঠাট্টা করে আজ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছে, তার বক্তব্য এর চেয়ে বড় কোন চিন্তার কথা হয়ে উঠতে পারেনি। খুবই সহজ ও সরল একটা সত্যের স্বীকৃতি—নিজেই বুঝে-শুনে একটা বিয়ে করে ফেলা।

আজ কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করে পারে না তপতী, এই সরল সত্যটাই কী দুরূহ সত্য! কাউকে যে বুঝতেই পারা গেল না। আর, শুনতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাও পরে শোনা গেল যে, সেটুকুও নিতান্ত ভুল শোনা একটা ফাঁকি। ভয় পেয়েছে, সাবধান হয়ে গিয়েছে, সময় থাকতেই পিছিয়ে এসেছে তপতী। এগিয়ে যাবার আর ইচ্ছেই হয়নি। তা না হলে নতুন ব্যারিস্টার স্থকোমলের সঙ্গে পাঁচ বছর আগেই তপতীর বিয়ে হয়ে যেত।

বিয়েটা প্রায় হয়ে যেতেই বসেছিল। সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল, গুড ফ্রাইডের পর সিমলা থেকে স্থকোমল ফিরে এলেই তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে। গ্লাসগোতে বড়দার কাছে, আর পশ্চিম বার্লিনে মেজদার কাছে টেলিগ্রামও করেছিল বিমল, এইবার অন্তত একবার দেশে এসে ঘুরে যাও। না এলে কেমন দেখায়? তপতীর বিয়ের সব ঠিক।

স্থকোমলকে বুঝেছিল তপতী, চার-মাসের পরিচয় আর মাসে অন্তত দশদিন করে দেখা আর গল্প করবার পর কাউকে বুঝতে কতটুকুই বা আর বাকি থাকে? শুনেও ছিল তপতী, স্থকোমলের মত ভদ্র বিনয়ী আর মার্জিত রুচির মানুষ আজকাল, বিশেষ করে আজকালকার বিলেত ফেরত শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। স্থকোমলের চরিত্রের এই সত্যের বার্তাটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন অমিতার মা। অমিতা আরও খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি তো মাত্র চার মাসের পরিচয়ে স্থকুদাকে চিনেছ তপতী;

আমি চিনি ছেলেবেলা থেকে। এত গুণী মানুষ হয়েও এত নিরহংকার মানুষ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বান্ধবীর কানের কাছে ফিসফিস করতে একটুও কুণ্ঠা অনুভব করেনি তপতী—আমিও চিনেছি; তুমি সার্টিফিকেট না দিলেও চলবে।

অমিতা—ছাই চিনেছ।

তপতীর চোখ দুটো চমকে ওঠে,—তার মানে ?

অমিতা—চার মাস ধরে সুকুদার সঙ্গে এত মন জানাজানির খেলা খেললে, কিন্তু জানতে পেরেছ কি যে…।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে তপতী—কি ?

অমিতা—বিলেতী গান কত ভাল গাইতে পারেন সুকুদা ?

—কি আশ্চর্য; যেন একটা বিস্ময়ের সুখ সহ্য করতে গিয়ে অমিতারই একটা হাত আস্তে চেপে ধরে তপতী। —না, সত্যিই জানতে পারিনি; ভদ্রলোকও কোনদিন বলেননি যে, এরকম কোন গুণ…।

অমিতার মা আর অমিতা চলে যাবার পরেও তপতীর মন সেদিন যেন একটা স্নিগ্ধ অহংকারের আবেশে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। যা আশা করে তপতীর জীবন, সুকোমল যেন তার চেয়েও কিছু বেশি প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু তারপর আর একটা মাসও পার হয়নি বোধ হয়। কপালে রুমাল চেপে আর দুই চোখ বন্ধ করে, ঝিকঝিকে মিররটার সামনে যেন নিজেকে অন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকে তপতী। তপতীর জীবনের আশা যেন একটা ভয়ানক ঠাট্টায় আহত হয়েছে। আয়নাতে নিজের মুখটাকেও দেখতে লজ্জা করে। একটা ভয়াতুর লজ্জা।

বিলেতী গানের এতবড় গুণী ভদ্রলোক যে এক বিলেতী মেয়ের ভালবাসার টানেও পড়েছিলেন, এই সত্যের একটা সামান্য আভাসও

কোনদিন সুকোমলের কোন কথায় ভুলেও ধরা পড়েনি; অথচ লণ্ডন জীবনের কত গল্পই না করেছে সুকোমল। হ্যাঁ, গুণী বটে সুকোমল, কলঙ্ক গোপন করে রাখার ভাল আর্ট জানে। ছোড়দা যদি আজ নীতীশ মামার বাড়িতে না যেত, তবে বিলেত-ফেরত ডাক্তার অবনী নাথের সঙ্গে দেখা হতো না, আর, সুকোমলের জীবনের এই গোপন ইতিহাসের ভয়ানক কাহিনীটাও শুনে আসতো না।।

অবনী ডাক্তারই আশ্চর্য হয়ে আর একটু ভয় পেয়ে সব বলে দিয়েছেন। অবনী ডাক্তারের নিজের চোখে দেখা সেই বিলেতী মেয়ের যত কাণ্ড-কারখানার কথা। সুকোমলের গা ঘেঁষে ছায়ার মত সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো মেয়েটা। সেই মেয়ে নাকি এখনও সুকোমলের কাছে চিঠি লিখছে।

গুড ফ্রাইডের পর সিমলা থেকে কলকাতায় ঠিকই এসেছিল সুকোমল। কিন্তু তপতীর সঙ্গে দেখা করবার ও আর কোন সুযোগ পায়নি। বিমলই জানিয়ে দিয়ে এসেছিল, তপতী এখন বিয়ে করতে রাজি নয়।

—কেন রাজি নয়? আশ্চর্য হয়েও প্রশ্ন করতে ভুলে যায়নি সুকোমল। আর, বিমলও সংক্ষেপে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পেরেছিল, তপতীই জানে কেন সে রাজি নয়। আমি কি করে বলি!

সেই সুকোমল এখন অতীতের একটা গল্প মাত্র; তপতীর জীবনের সঙ্গে সে গল্পের কোন সম্পর্ক আজ আর নেই। এবং সে জন্যে তপতীর জীবনে কোন আক্ষেপও আছে বলে মনে হয় না। বরং, ভাবতে গিয়ে যেন একটা মুক্তির হাঁফ ছেড়েছে তপতীর মন; একটা ফাঁকির ভয় থেকে মুক্তি। একটা ছলনার গ্রাস থেকে রেহাই পেয়েছে তপতীর আশা।!

সুকোমলকে কি সত্যিই ভালবেসেছিল তপতী? সেদিন হয়তো

তাই বিশ্বাস করতে চেয়েছিল তপতী; কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ আর নিজের মনটাকে বুঝতে কোন ভুল হয় না: কারণ মনটাকে চিনেছে তপতী।

না বুঝে-শুনে যে ভালবাসতে পারা যায় না। ভালবাসবার মত মনে হলে তবে তো ভালবাসতে পারা যাবে? তবে ইচ্ছাটাকে আজও বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে নেই, ভালবাসতেই চায় তপতী।

সুকোমলের মত মানুষকে নিশ্চয় ভালবাসতে পারা যাবে; এই বিশ্বাসে মনটা ভরে উঠেছিল বলেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল তপতী। কিন্তু, সে বিশ্বাসটাই একদিন মিথ্যে হয়ে গেল। সুকোমলের জীবনের গোপন করা ভয়ানক সত্যটাই সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিল। এমন মানুষকে ভালবাসতে পারা যাবে না; তবে কেন মিছে আর, শুধু চার মাসের একটা সামান্য জানা-শোনার মুখরক্ষা করবার জন্যে একটা মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া?

হরেন কাকাও খুব আশা করেছিলেন, আর বেশ খুশি মনে বারবার এসে তপতীর খবর নিয়ে যেতেন, শরীরটা ভাল আছে তো? রাত জেগে বই পড়বার বাতিক বন্ধ হয়েছে তো? না, এখন আর ছেলেমানুষী করো না তপতী। সময় মত স্নান খাওয়া-টাওয়া করবে। এত ভাল স্বাস্থ্যটাকে ভুল করে কাহিল করে ফেল না।

হরেন কাকাই বোধ হয় সত্যিকারের দুঃখ পেয়েছিলেন, তপতীর সঙ্গে সুকোমলের বিয়ে হলো না। কিসের বাধা, কি-এমন অসুবিধা, যার জন্য চার-মাসের চেনা-শোনা একটি ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়েও শেষে রাজি হলো না তপতী?

—কি হে বিমল? তপতী বিয়ে করতে রাজি নয় কেন?

—তপতীই জানে। এর বেশি কোন কথা হরেন কাকাকেও বলতে পারেনি বিমল।

হরেন কাকার আশাভঙ্গ মনের দুঃখটা বেশ একটু রূঢ়স্বরে বিলাপ করে ফেলেছিল—রাজি হলে ভালই করতো তপতী। সুকোমলের চেয়ে ভাল ছেলে কটাই বা পাওয়া যায়? আর তপতীও এমন কিছু নয় যে…।

অভিযোগের কথাটাকেও সামলে নিয়েছিলেন হরেন কাকা। তা না হলে বলেই ফেলতেন বোধ হয়, তপতী রূপে-গুণে কি-এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী যে, সুকোমলের মত ছেলেকেও বিয়ে করতে রাজি হলো না?

আর একটা বিস্ময়ের কথাও নিশ্চয় বলতেন, সুকোমলের সঙ্গে সত্যিই কি তপতীর ভালবাসা হয়নি? না হয়ে থাকলে…হয় না কেন? এটাও তো অদ্ভুত ব্যাপার।

তপতীর বিয়ে হলো না, দুঃখটা যেন শুধু হরেন কাকার। হরেন কাকার গম্ভীর মুখ দেখে তপতীর বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি যে, রাগ করেছেন হরেন কাকা। কিন্তু আসল কথা জানেন না বলেই এভাবে তপতীকে ভুল বুঝে রাগ করতে পারেন হরেন কাকা। সুকোমলকে যতটা শান্ত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলে ধারণা করেছেন তিনি, সুকোমল সত্যিই ততটা যে নয়। জানলে রাগ করতেন না হরেন কাকা।

কিন্তু ঘরের ভিতরে তপতী দাঁড়িয়ে থাকলেও, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হরেন কাকা বিমলের কাছে অভিযোগের সুরে যে-মন্তব্যটা করেছিলেন, সেটা স্পষ্ট শুনে ফেলেছিল তপতী। তপতীই বা রূপে-গুণে কি-আর এমন…।

কি-করে এত শক্ত কথা বলতে পারেন হরেন কাকা? হরেন কাকা যে তাঁর নিজেরই একটা বিশ্বাসের আনন্দকে ঠাট্টা করলেন। তপতীকে কথায় কথায় রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী বলে পাঁচজনের কাছে যিনি এতদিন প্রশংসা করে এসেছেন, তিনি হলেন হরেন

কাকা। অথচ তিনিও আজ তপতীর জীবনের একটা অতি সাধারণ সতর্কতার দাবিকে বুঝতে না পেরে তপতীকেই ভুল বুঝলেন।

দাবি বলতে এই তো সামান্য একটা দাবি, যাকে বিয়ে করতে হবে তাকে যেন আগেই চিনে নিতে পারা যায়, চিনতে যেন ভুল না হয়। সত্যিই ভালবাসবার মত মানুষ কিনা, সেটুকু না জেনে সে মানুষের জীবনের কাছে গিয়ে ঠাই চাওয়া যায় না; উচিতও নয়। যেখানে মিল নেই, সেখানে মিলন হবে কেমন করে? যদি হয়, তবে সেটা নিছক একটা মিলনের নকল, স্টেজের উপর নাটকে মিলনের মত একটা জাঁকাল ঘটনা, কিন্তু ভিতরটা রিক্ত; সে মিলনের ভিতরে মন বলে কিছু থাকতে পারে না।

সুকোমলের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হবে না, এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে সেই যেদিন রাগ করে কথা বলেছিলেন হরেন কাকা, সেদিন থেকে শুরু করে আজকের এই দিন, মাঝখানে প্রায় পাঁচটা বছরের ব্যবধান। বছরের পর বছর, এক একটা বৈশাখী ভোরের আলো আর কার্তিকী সন্ধ্যার কুয়াশা সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর এই পথের দু'পাশের গাছের মাথায় অজস্র মুহূর্ত ঝরিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি দিনও, এমন একটিও কথা বলেননি হরেন কাকা, যাতে মনে হতে পারে যে, তপতীর বিয়ের জন্য তাঁর মনে কোন চিন্তা বেচে আছে। কতরকম আশার গল্প করে আর ইচ্ছার কথা বলে চলে গিয়েছেন হরেন কাকা; কিন্তু তাপতীর বিয়ের কথা নিয়ে কোন আশার কথার ছায়াটুকুও তার মধ্যে ছিল না। বিমলের বিয়ের জন্য যিনি এত চিন্তা করলেন, এত ছুটোছুটি করলেন, তাঁরই আচরণে এটা যে সত্যিই একটা কঠোর বিস্ময়, তপতীর বিয়ের জন্য একটা সামান্য আগ্রহের কথাও তিনি বলেননি।

তাই তপতীর মনটা চমকে উঠেছে, যেন পাঁচ বছরের এই স্তব্ধতাকেই বিচলিত করে দিয়ে হরেন কাকার অনুরোধের কথাটা বেজে উঠেছে।

কিন্তু হরেন কাকা জানেন না; এবং জানলে হয়তো কথাটা বলা দরকারই মনে করতেন না। এই পাঁচটা বছর তপতীর কাছে কিন্তু একটা স্তব্ধতা নয়। এই পাঁচ বছরের জীবনেও তপতীর আশার কাননে পাখি ডেকেছে; ফুলও ফুটেই এসেছে। ইচ্ছাটা স্বপ্নের মধ্যেও শানাই-এর সুর হয়ে বেজেছে। তপতীর আত্মাটাই যে এই পাঁচ বছর ধরে ভালবাসার সন্ধানে পৃথিবীর অনেক আলোছায়া ও অনেক মুখের দিকে তাকিয়েছে। সে ইতিহাস জানেন না হরেন কাকা।

ঠিকই, কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জেনেছেন, ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশে পৌঁছেছে তপতীর বয়স; তবু বিয়ে হয়নি তপতীর। ভবতোষের মেয়ের জীবনটা এরকম একটা রিক্ততায় ভরে উঠবে, কোন দুঃস্বপ্নেও কি এমন ভয়ের ছবি দেখেছিল ভবতোষ?

তপতীর মা জয়ার সেই রোগমলিন মুখের কথাগুলিতে যে আশা ধ্বনিত হয়েছিল, তা'ও যে মিথ্যে হয়ে গেল।—আমার আর বেশি দিন বাকি আছে বলে মনে হচ্ছে না হরেন দা?

—ওটা আপনার মনের বাতিক।

—না হরেন দা, বাতিক বলুন আর যা-ই বলুন; আমার মনে হচ্ছে, আমি আর থাকবো না, তপতীকে বিয়ে দেবার চিন্তাটা আপনাকেই ভুগতে হবে।

—চিন্তাটা ভুগবো কেন, উপভোগ করবো! আপনি বরং চিন্তা-টিন্তা ছেড়ে দিন!

—হ্যাঁ, ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা··

—বলুন।

—আগে মেয়েটাকে পার করবেন।

—তার মানে?

—অমলের বিয়ের আগেই তাপতীর বিয়েটা যেন হয়ে যায়।

—তা হয়ে যাবে।

তাই, হরেনকাকার চিন্তার এই পাঁচবছরের স্তব্ধতা যেন তাঁর অকৃতিত্বের, একটা লজ্জার, একটা অপরাধের স্তব্ধতা। জয়ার অনুরোধ সফল করে তুলতে পারেননি তিনি। ভবতোষের এই বাড়ির আশার বিরুদ্ধে যেন চক্রান্ত করে একটা বিদ্রূপের আহ্লাদ তিন ছেলেরই বিয়ে আগে ঘটিয়ে দিল, আর একা পড়ে রইল শুধু মেয়েটা।

বোধহয় সন্দেহ করেছিলেন হরেনকাকা, তপতী মেয়েটার মনেরই ভিতরে সেই বিদ্রূপটা লুকিয়ে আছে। তা না হলে সুকোমলের মত ছেলেকে সরিয়ে দেবে কেন তপতী? তপতীর উপর এত রাগ করবার কারণটাও বোধ হয় এই যে, তপতীর মার কাছে তাঁর এত বড় গলা করে বলা সান্ত্বনার কথাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছিল তপতী।

যার বাধায় সুকোমলের মত ছেলেকে বিয়ে করতে পারেনি তপতী, তাকে হরেনকাকা একটা বিদ্রূপ বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তপতী জানে, সেটা একটুও বিদ্রূপ নয়; সেটা তপতীরই জীবনের একটা সত্য, একটা সামান্য সাধ। মিল নেই, মনের মত নয়; এমন মানুষ যেন তপতীর আপন জন হতে না আসে।

সমস্যাটাকে চারুমাসী একদিন খুব সহজ করে বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন হরেনকাকা সামনে ছিলেন না, তিনি শুনতে পাননি।

—কি আর করতে পারে মেয়েটা? কাউকে পছন্দ হলে তবে তো বিয়ে করবে। এটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়।

হরেনকাকারই বাড়ির ভাড়াটে, চক্রধর বাবুর স্ত্রী সামনেই ছিলেন। তিনি কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করে চারুমাসীকে কিছুক্ষণের

জন্য নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন, আর তপতীর মনটাও চমকে উঠেছিল।—আমি বলি, পছন্দ হয় না কেন ?

চমকে উঠলেও তাপতীর মনের দাবিটা যেন রাগ করে, তপতীর মুখের হাসিটাকেও একটু তপ্ত করে তোলে। ইচ্ছে করে, এখনই বেশ পরিষ্কার ভাষায় মহিলাকে জানিয়ে দিলে হয়—মনের মত মনে হয় না বলেই পছন্দ হয় না।

ইচ্ছেটা রূঢ় হয়ে উঠলেও তপতীর মুখের ভাষাটা অবশ্য রূঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। বরং, শেষ পর্যন্ত হেসে হেসে বলতে পেরেছিল তপতী—কি করে বলি মাসিমা, কেন পছন্দ হয় না।

চারুমাসী আর চক্রধর বাবুর স্ত্রী, দু'জনেই কিন্তু কিছুক্ষণ তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা মুগ্ধতার সুখ সহ্য করতে চেষ্টা করেন। তপতীর সামনেই দুজনে বলাবলি করেন—মেয়েটার চোখ দুটো কী চমৎকার। হাসলে কী সুন্দরই না দেখায় মেয়েটাকে। আলতা পরে না মেয়েটা, কিন্তু পরলে পা দুটোও যেন হেসে উঠতো।

চক্রধর বাবুর স্ত্রী বলেন—এমন রাঙ্গা টুকটুকে পায়ে আলতার দরকারই হয় না।

—একটু থামুন। রক্ষে করুন। চেঁচিয়ে বাধা দিতে গিয়েও তপতীর মুখের হাসিটা আরও লাজুক হয়ে যায়। —চা নিয়ে আসি, বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে যায় তপতী। চারুমাসী আর চক্রধর বাবুর স্ত্রী, দু'জনে তেমনই মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকেন, মেয়েটার পায়ে জরিদার চটিও কী সুন্দর মানিয়েছে! পা দুটোই যেন ঝিকমিক করছে।

এত ভাল লেখাপড়া শিখেছে, গানে-বাজনায় এত গুণী, এত সুন্দর দেখতে, আর সাজে পোষাকে এত শখ; এ মেয়ে কেন এত বিয়ে-ভীরু মেয়ে হয় ? এই অবুঝ রহস্যটাকে নিয়ে আরও অনেক কথা

বলাবলি করে সেদিন চলে গিয়েছিলেন চারুমাসী আর চক্রধর বাবুর স্ত্রী, তার পরেও যে চারটে বছর পার হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরেনকাকা না বুঝুন, আর চারুমাসী কিংবা চক্রধর বাবুর স্ত্রী কিছু না বুঝুন কিংবা না জানতে পারুন, তপতী জানে, এরই মধ্যে কতবার আশার ছবি দেখতে হয়েছে, আর তার পরেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে।

মেজদার সঙ্গে একই প্লেনে জার্মানীতে অ্যানথ্ পলজি পড়তে চলে গেল যে, সেই মণীন্দ্রর সঙ্গেও তপতীর কথা বলবার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। মেজদা বাড়ীতে ছিল না, অথচ মেজদাকে কয়েকটা জরুরি কথা জানাবার আছে; তাই ড্রইং রুমে অনেকক্ষণ ধরে মেজদার অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল মণীন্দ্র। অগত্যা, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে তপতীকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।—শ্যামলদাকে যদি কোন জরুরি কাজের কথা জানাবার থাকে, তবে আমার কাছে বলে যেতে পারেন। শ্যামলদা বাড়িতে এলেই···।

জরুরি কথাগুলি তপতীর কাছে বলে দেবার পরে আরও কিছুক্ষণ ছিল মণীন্দ্র। আর তপতীর সঙ্গে কতগুলি নিতান্ত অজরুরি কথা বলতে, গল্প করতে আর বেশ খুসি হয়ে হাসতেও কোন সংকোচ অনুভব করেনি। অনুভব না করবারই কথা। তপতীর আচরণও কোন সতর্ক অহংকারে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে নি। মেজদার বন্ধু মণীন্দ্রের কাছে তপতী তার পোষা কাকাতুয়া হেনরীর যত বুদ্ধি আর দুষ্টুপনার গল্প বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনি।

মণীন্দ্র দেখতে ভাল। যার চোখে ছানি আছে, সেও বোধ হয় দেখে বুঝতে পারে, কী সুন্দর রূপের মানুষ এই মণীন্দ্র। অ্যানথ্ পলজি তপতীরও প্রিয়: এম-এ'তে তপতীরও পাঠ্য ছিল সোশ্যাল অ্যানথ্ পলজি। কথায় কথায় টেনিসের গল্পও এসে পড়ে। আর, হঠাৎ একটু অশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেও ফেলে তপতী—আচ্ছা এই সেদিন

কলম্বো থেকে টেনিসে ট্রফি জিতে নিয়ে এলেন যিনি, সেই মণীন্দ্র কি……।

মণীন্দ্র হাসে—হ্যাঁ, আমিই সেই মণীন্দ্র। মনে হচ্ছে, আপনিও টেনিস ভালবাসেন।

—ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু বাস্, ঐ পর্যন্ত।

—মানে?

—আমার টেনিস খেলা দেখে হেনরিও রাগ করে ধমক দেয়।

—কিন্তু আমার পাল্লায় যদি পড়েন; তার মানে কোন দিন আমার পার্টনার হয়ে যদি খেলেন, তবে আপনার খেলা দেখে আপনার হেনরি খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলবে।

তপতীরও হাসিটা যেন উতলা খুশির কাকলীর মত বেজে ওঠে। —হেনরি বেচারার কিন্তু হাত নেই।

খুশি মণীন্দ্র, খুশি তপতী। দু'জনের সম্মিলিত হাসির শব্দ যেন অদ্ভুত ছুটি গীতময় মিলের সিম্ফনি। কিন্তু হাসি থেমে যাবার পরেই তপতীর হাতের একটা বই-এর দিকে যেন ভ্রুকুটি করে মণীন্দ্র—আপনার হাতে ওটা কী? টলষ্টয় বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্য। আপনি আবার এসব বাজে জিনিসে ইন্টারেষ্টেড হলেন কেন?

—বাজে? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা কঢ় চমকের আঘাতে কেঁপে ওঠে।—টলষ্টয়কে আপনি বাজে বলছেন কেন?

—আমার তাই বিশ্বাস। আমি এই ন্যাকা ঋষিটাকে একটুও পছন্দ করি না।

—আমি পছন্দ করি।

—কেন?

—টলষ্টয় হলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর মন হিমালয়ের চূড়ার মত উঁচু।

—আমার তো মনে হয়, তিনি একটা উইচিপি।

—ভাল মন তৈরী করেছেন আপনি।

চমকে ওঠে মণীন্দ্রের চোখ দুটো। বুঝতে পারে মণীন্দ্র, তপতীর গলার মৃদুস্বরের মধ্যে যেন একটা রুষ্ট আপত্তির উত্তাপ ফুটে উঠেছে। আর কোন কথা না বলে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় মণীন্দ্র।

তপতীর মাথাটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে ঝুঁকে পড়ে। যেন অসতর্ক প্রাণটাই হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়েছে। মনের ভিতরে খুবই বিশ্রী একটা অস্বস্তি ছটফট করছে। এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা নিতান্ত অভদ্রতা হবে বলেই চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু মণীন্দ্রের সঙ্গে আর কোন কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। কথা বলতে ইচ্ছেই করছে না। টলস্টয়ের মত জ্ঞানীকে এত কুৎসিত নিন্দা করে কথা বলে যে, তার মনের সঙ্গে মিল রেখে কোন কথা বলা সম্ভবই নয়। টলস্টয়ের প্রতিভাও যার কাছে একটা উইচিপি মাত্র, তার কাছে তপতীর বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড়টা তো একটা ক্ষুদ্র আবর্জনা। সন্দেহ হয়, টলস্টয়ের নামে এইসব তুচ্ছতার কথা বলে মণীন্দ্র যেন তপতীরই শিক্ষিত অভিরুচি আর ধারণাগুলোকে তুচ্ছ করতে চেয়েছে।

ভাগ্যি ভাল, শ্যামল এসে পড়েছিল। তপতীকে আর এক মুহূর্তও হেঁটমাথা হয়ে এই কণ্টকাক্ত অস্বস্তিটা সহ্য করতে হয়নি। শ্যামল আর মণীন্দ্রের সঙ্গে জরুরি কথার আলোচনা শুরু হতে না হতেই ঘর ছেড়ে চলে যায় তপতী। ড্রইং-রুমে পাখার বাতাসও যেন একটা অদৃশ্য ঠাট্টার নিশ্বাস, এতক্ষণ ধরে অকারণে তপতীর শাড়ীর আঁচলটাকে ফুরফুর করিয়ে একটা মিথ্যা আশার ছবিকে রঙীন করে তুলেছিল।

ভোলে যায়নি তপতী, প্রায় তিনটি মাস, দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাবার আগের দিন পর্যন্ত মনের ভিতরে সারাক্ষণ কী বিশ্রী একটা লজ্জার বেদনা যেন কাঁটার মত বিঁধেছে। দার্জিলিং-এ যাবার

পর, দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় সকাল আর বিকালের সোনালী মায়ার খেলা দেখে দেখে আরও একটা মাস পার হয়ে গেল। তারই মধ্যে কবে যে এই লজ্জার বেদনাটা শান্ত হয়ে গেল, বুঝতে পারেনি তপতী। মণীন্দ্রের কথা আরও কতবার মনে পড়েছে, কিন্তু সে জন্য কোন আশাভঙ্গের লজ্জা বা বেদনা আর তপতীর মনের শান্তি নষ্ট করেনি। যেন আয়নার বুকে ঝরা পাউডারের একটা দাগ দেখা দিয়েছিল, সে দাগ নিজেই হঠাৎ একদিন মুছে গেল।

দার্জিলিং-এ আরও দুটো মাস থাকবার কথা ছিল, কিন্তু থাকতে আর পারা যায়নি। কারণ, কলকাতা থেকে খবর গেল, তপতীর একটা আশার চেষ্টা সফল হয়েছে। এতদিন ধরে ডাচ মিশনারীরা যে মেয়ে-কলেজটা চালিয়ে আসছিলেন, সে কলেজকে গভর্ণমেন্টও সাহায্য করতে রাজী হয়েছে। নূতন চারজন অধ্যাপক নেবার কথাও হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, আর তপতীও দরখাস্ত করেছিল। কলেজ কাউন্সিল সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। মাইনে তিনশো দশ টাকা। ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রীদের হিস্ট্রি পড়াতে হবে। বিশেষ করে, হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড।

হিস্ট্রি পড়তে ভালবাসে যে, হিস্ট্রি পড়াবার কাজটাও তার ভাল লাগবে। বেশ একটা আনন্দের কাজ পাওয়া যাবে, জীবনের দিনগুলি তবু একটা মনের মত কাজের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যাবে। এই রকম একটা ইচ্ছার তাগিদ ছিল বলে এই কাজের জন্য দরখাস্ত করে ছিল তপতী। তা ছাড়া, হরেনকাকাও বলেছিলেন—হিস্ট্রিতে যখন ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছিস, তখন চেষ্টা করে দেখ, কোন কলেজে পড়াবার একটা কাজ; অন্তত একটা লেকচারারের কাজ পাওয়া যায় কিনা।

তিনশো দশ টাকা অবশ্য তপতীর জীবনের তেমন কিছু প্রয়োজন নয়। কিন্তু কাজটার বোধ হয় প্রয়োজন ছিল। কাজটা মনের মত, শুধু

এই জন্যেও বোধহয় নয়। মনের মত অনেক কথা বলবার আর পাঁচ জনকে সে কথা শোনাবার একটা সুযোগও পাওয়া যাবে, সেই জন্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস যাকে খুব শ্রদ্ধা করে, সেই কুইন এলিজাবেথকে তপতীও যে শ্রদ্ধা করে না তা নয়। কিন্তু শ্রদ্ধা করেও কেন যেন ভালবাসতে পারা যায়না! মনে প্রাণে ভাল লাগে কুইন মেরি স্টুয়ার্টকে। ছাত্রীদের কাছে ইতিহাসের কাহিনী বলতে গিয়ে আজ যেন তপতীর একটা গোপন মর্মবেদনার আবেগ মুখর হয়ে উঠবার দুঃসাহস পেয়ে যায়। মেরি স্টুয়ার্টকে ভুল বুঝেছে ইতিহাস; সেদিনও নিতান্ত ভুল বুঝে সেই মহীয়সী নারীর প্রাণ হরণ করা হয়েছিল।

মেরি স্টুয়ার্টকে কেন ভাল লাগে? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর বোধ হয় আজও তৈরী করতে পারেনি তপতী। নইলে সেদিন সেই ছাত্রীটির প্রশ্নের, মিস মুরিলো নামে ফিলিপিনের সেই মেয়েটির প্রশ্নেব উত্তর তখনি দিয়ে দিতে পারা যেত। মেরি স্টুয়ার্টকে আপনাব এত ভাল লাগে কেন? মিস মুরিলোর প্রশ্নেব উত্তর দিতে গিয়ে তপতী শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল—জানি না, কেন ভাল লাগে। তবে এইটুক্ জানি যে, মেরি স্টুযার্টের মৃত্যুদণ্ডের পিছনে ছিল পুরুষের ইচ্ছার চক্রান্ত। নারীর মহত্ত্ব পুরুষ সহ্য করতে পারে না। পুরুষ নারীকে ভুল বুঝতে ভালবাসে।

মিস মুরিলো খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। ক্লাসের প্রায় সব ছাত্রীই হেসে ফেলেছিল। তপতীও হেসেছিল। কিন্তু বলতে ভুলে যায়নি যে, আমার কথাগুলি শুনতে একটু কড়া মনে হলেও নিতান্ত মিথ্যে নয়। পুরুষের লেখা ইতিহাস নারীজাতির প্রতি সুবিচার পেয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া...।

মিস মুরিলো আবার হেসে ওঠে—কিন্তু ফরাসীরা বলে, শেরশে লা ফাম।

—বাজে কথা বলে। তপতী হাসতে গিয়েও ভ্রূকুটি করে। ইতিহাসের সব ঝঞ্ঝাটের ঘটনার পিছনে নারীকে দেখতে পাওয়া যায়; এর চেয়ে মিথ্যে অভিযোগ আর কিছু হতে পারে না। ইতিহাসের সব গণ্ডগোলের আর উৎপাতের মূলে আছে পুরুষের ভুল। আরও মজার ব্যাপার; পুরুষের ভুল বেশ ক্ষমা পেয়ে যায়, কিন্তু নারীর ভুল কোন ক্ষমা পায় না। নইলে একটা ভুলের জন্য আনারকলির জীবন্ত সমাধি হবে কেন, আর সেলিম শাস্তি পাওয়া দূরে থাকুক, একেবারে বাদশাহী গদি পেয়ে যাবে কেন?

শুধু তপতীর ছাত্রীদের ধারণাতে নয়; কলকাতার যত পিসিমা আর মাসিমাদের ধারণাতেও একটা সন্দেহ এরই মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে তপতী যেন তার মনের কথাগুলিই বলে ফেলে। পুরুষের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ, একটা আক্রোশের ভাব মনের ভিতর না থাকলে কি এরকমের কথা ঠাট্টা করেও বলতে পারে কোন নারী?

ছাত্রীরা আড়ালে আলোচনা করে, তপতীদি-র বয়স কত হবে?

কেউ বলে পঁচিশ, কেউ কেউ বলে তিরিশের বেশি নয়। কিন্তু অমিয়া বলে, প্রায় পঁয়ত্রিশ।

অমিয়ার ধারণার প্রতিবাদ করতে পারে না ছাত্রীরা। কারণ, সকলেই জানে, অমিয়া হলো তপতীদির এক মাসতুতো দিদির মেয়ে। অমিয়া বলে—মার কাছেই শুনেছি, মার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট হলেন তপতী মাসী। মা'র বয়স এখন ছত্রিশ।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলো, দেখতে এত সুন্দর, তবু হিষ্টির তপতীদি-র আজও বিয়ে হলো না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে আর অসুবিধাও হয় না। তপতীদি নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করেননি। এবং এই অনিচ্ছারও একমাত্র কারণ এই যে, পুরুষের সম্পর্কে তপতীদির মনে বোধ হয়···হয় ভয়, নয় রাগ, কিংবা ঘৃণা আছে।

হরেনকাকাও বোধ হয় এইরকম সন্দেহ করে বসে আছেন। তা না হলে আজ এভাবে এরকম একটা করুণ চেহারা করে আর কাতর দাবির মত সুরে তপতীকে অনুরোধ করবেন কেন—তুমি এবার বিয়ে কর তপতী। আর, বিমলই বা বিদেশে রওনা হবার আগের মুহূর্তে ওরকম একটা বিষণ্ণ আবেদনের সুরে বলবেই বা কেন—তুই এবার বিয়ে কর তপতী।

কলকাতার মাসীমারা আর পিসিমারা কিন্তু কোনদিন তপতীকে এমন কথা বলতে শোনেন নি যে, বিয়ে করবে না বলে কোন প্রতিজ্ঞা আছে তপতীর মনে। বিয়ে করতে কোন অনিচ্ছার কথাও গর্ব করে কোন দিন বলেনি তপতী। বরং দেখা গিয়েছে, পরের বিয়েতে এহেন তপতীরও কত উৎসাহ। আলিপুরের ছোট মাসী বলেন, সুলেখার বিয়ের দিন ভাগ্যিস সন্ধ্যা হবার আগেই এসে পড়েছিল তপতী। ছেলের বাড়ির মেয়ের দল দুপুর থেকেই এসে আর মুখ গম্ভীর করে একটা সমস্যা ঘনিয়ে তুলেছেন। অভিযোগ, ফটোতে মেয়েকে যেমন সুন্দর মনে হয়েছিল, মেয়ে সত্যিই তেমন সুন্দর নয়। বরং বেশ একটু কুশ্রী বলেই মনে হচ্ছে। ছোট মাসীর বুক দুরুদুরু করেছিল। ছেলের বাড়ির এইসব মেয়েদের এরকম গম্ভীর মুখের থমথমে ভাব, কোঁচকানো চোখের নীরব ভৎর্সনার চাহনি, আর হতাশার ফিসফাস শেষ পর্যন্ত বিয়েটাকেই বিপদে ফেলবে না তো?

কিন্তু তপতী এসেই আর সমস্যার কথাটা শুনেই হেসে ফেললো—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ঠিকই, সবই ঠিক করে দিয়েছিল তপতী। সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে তখনি ঘরের ভিতরে ঢুকে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আর কপাট বন্ধ করে দিল তপতী। কপাট খুললো যখন, তখন প্রায়

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর বরযাত্রীরা প্রায় সকলেই এসে পড়েছে। বরের আসবার সময়ও হয়ে এসেছে।

সুলেখাকে সাজাতে চার ঘণ্টা সময় নিয়েছিল তপতী। কিন্তু সার্থক হয়েছে এতটা সময়। এখন কার সাধ্যি আছে যে বলতে পারে, সুলেখা মেয়েটা দেখতে কালো আর রোগা? এ সুলেখা যেন সে সুলেখাই নয়। সুলেখার মুখের হাসিটাও বদলে গিয়ে কী অদ্ভুত মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। যেন রঙীন বেনারসীতে জড়ানো একটি ঢলঢলে মায়ার সুন্দর ছবিটি হয়ে হাসছে সুলেখা। ছোট মাসী তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেঁদে ফেললেন—এ কী কাণ্ড করেছিস তপতী। তুই জাদু জানিস মনে হচ্ছে।

তপতী চেঁচিয়ে ডাক দেয়—কই, ছেলের বাড়ীর মেয়েরা কোথায় গেলেন আপনারা?

একজন মোটা-সোটা আর দাঁত-উচু মহিলা, যিনি হলেন ছেলের মামাতো বোন, তিনি সবার আগে এগিয়ে এসে ভ্রূভঙ্গী করেন—কেন? কিসের এত হাঁক ডাক?

তপতী—এবার ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মেয়েকে একবার দেখে নিন।

দাঁত-উঁচু মুখটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ফেলেছিল। ঘরের ভিতরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সুলেখা একবার ভয়ে-ভয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু মহিলা যেন আতঙ্কিতের মত বলে উঠলেন—অ্যাঁ, এ কে! বড় সুন্দর তো মেয়েটি!

তপতী—স্বীকার করছেন তাহলে?

মহিলা—কি বললেন?

তপতী—সত্যি সুলেখা যে ফটোর সুলেখার চেয়ে সুন্দর, এটা এখন স্বীকার করবেন তো?

আর সব মেয়েরাও ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে, ফিসফিস করে—তা···সুন্দর বটেই তো···এরকমটি হলে সুন্দর হবে না কেন?

বিয়ে হয়ে যাবার পর বাড়ি ফেরার আগে তপতী ছোট মাসির কাছে বাসরঘরের একটা সংবাদও জানতে পেরেছিল। ছোট মাসিই বললেন—শুনেছ তপতী, সুলেখাকে দেখে ওর বর খুশী হয়েছে।

—কে বললে ?

—সবাই বলছে। বর শুধু কনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর কারো সঙ্গে কথা বলছে না ; বলতে ভুলেই যাচ্ছে বোধ হয়।

—যাক, আমার চার ঘণ্টার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তাহলে। ছোট মাসির কাছে যেন একটা মস্তবড় কৃতার্থতার আনন্দ ব্যক্ত করে বাড়ি ফিরেছিল তপতী।

এমন মেয়ে কেন যে শুধু নিজের বিয়ের উৎসাহটাকে আজও কাছে ডাকতে পারছে না, এটাই একটা রহস্য। কারও চোখে পছন্দ ধরাতে হলে, কোন সুপুরুষের অহংকেরে চোখ দুটিকে মুগ্ধ করে দিতে হলেও তপতীর পক্ষে সাজবার কোন দরকার হয় না। ছোট মাসি আজও পাটনার বাড়ির একটা ঘটনার কথা মাঝে মাঝে বলেন। তপতী তখন পাটনাতে ছোট মাসির কাছেই ছিল। পাশের বাড়ির মেয়েটির যেদিন পাকা-দেখা, সেদিন মেয়ের মা হঠাৎ এসে ছোট মাসিকে অনুরোধ করেছিলেন, আজ সন্ধ্যাবেলা তপতী যেন পাকা-দেখার ব্যাপার দেখবার জন্যে আর-পাঁচজনের সঙ্গে গিয়ে ভিড় না জমায়।

—কেন ?

—শুনে রাগ করবেন না। আমার মেয়ে দেখতে ভাল নয় ; তার ওপর বরপক্ষও বেশ খুঁতখুঁতে। এর ওপর তপতীকে যদি আবার ওদের চোখে পড়ে, তবে···বুঝতেই পারছেন, আমার শোভনাকে ওদের চোখে কত কুৎসিতই না মনে হবে, হয়তো পাকা-দেখাটাও কেঁচে যাবে।

হেসে ফেলেছিলেন ছোট মাসি—বেশ, তাই হবে, তপতী যাবে না।

ছোট মাসির মুখে পাটনার এই ঘটনার গল্প এখনও মাঝে মাঝে শুনতে পায় তপতী; কিন্তু সে গল্প আজ আর তপতীর মনের কোন ধারণা প্রসন্ন করে তোলে না। নিজের সম্বন্ধে, নিজের সুন্দর চেহারাটার জন্যেও নতুন করে কোন অহংকার জাগে না।

পৃথিবীতে এই তপতী কারও চোখে পড়লো না, কেউ দেখে মুগ্ধ হলো না, তপতীকে আপন করে নেবার জন্যে কারও ইচ্ছা আর আশা কোন স্বপ্ন দেখলো না, এটা সত্য নয়, এটা তপতীর জীবনের অভিযোগও নয়। দার্জিলিং-এর ইন্দ্রনাথ, স্টেভেডর শশাংক আর এয়ার ফোর্সের ফ্লাইট-লেফট্‌ন্যান্ট চিত্তরঞ্জন—ওরা তো যেচেই নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিল, হরেন কাকার কাছেও চিঠি দিয়েছিল; কিন্তু সেসব চিঠির আর প্রস্তাবের দাবি মেনে নিতে পারেনি তপতী। ইচ্ছেই হয়নি। ইন্দ্রনাথ শুধু টাকার মানুষ, বি-এ পরীক্ষায় তিনবার ফেল করে এখন শুধু কাঠের কারবার করে; শশাংক বিপত্নীক; আর চিত্তরঞ্জন দেখতে একটুও সুশ্রী নয়। তপতীর জীবনের অভিরুচির সঙ্গে যাদের জীবনের এত অমিল, তাদের কাউকে জীবনের সঙ্গী করা উচিত নয়। কারও উপর কোন অশ্রদ্ধা নয়, তপতী শুধু তার নিজেরই অভিরুচিকে অশ্রদ্ধা করবার ভয় থেকে বাঁচতে চায়।

এইতো সেদিন, নিজের চোখে দেখে এসেছে তপতী, সুমঙ্গলার জীবনটা কী ভয়ানক দুঃখের জীবন হয়ে গিয়েছে। এত হাসতো যে সুমঙ্গলা, সে সুমঙ্গলা তিন ঘণ্টার এত গল্পের মধ্যেও একটিবার হাসলো না। সুমঙ্গলার এসরাজ ঘরের কোনে পড়ে রয়েছে। বোধ হয় আধ ইঞ্চিরও বেশি পুরু হয়ে ধুলো পড়েছে এসরাজের উপর।

—একি, এসরাজটার এ দশা কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল তপতী।

—আর এসরাজ! আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুমঙ্গলা।

তপতী—এসরাজ বাজানো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তিন বছরের মধ্যে একটিবারও এসরাজে হাত দিইনি।

—কেন?

—দরকার হয়নি।

—তার মানে?

—তার মানে ভদ্রলোক একটুও পছন্দ করেন না।

—কেন পছন্দ করেন না?

—সেটা উনিই জানেন। আমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করিনি।

—কিন্তু তুই তাহলে বেঁচে আছিস কি করে? তুই এসরাজ বাজাবি না, গাইবি না, এ কি করে সম্ভব? এসরাজ আর গান যে তোর প্রাণ ছিল সুমঙ্গলা।

—এখন আর নেই।

—ভদ্রলোক তাহলে কি পছন্দ করেন?

—রান্না।

চমকে ওঠে তপতী—রান্নার নামে যে তোর গায়ে জ্বর আসতো।

—একদিন আসতো ঠিকই, কিন্তু এখন আর নয়। এখন রোজই একটা না একটা মাংস নিয়ে……।

—তার মানে?

—কোনদিন ভেড়ার মাংস, কোনদিন গ্রাম-ফেড খাসির মাংস, কোনদিন বা কচি চিকেন কিংবা টার্কি, নয়তো গ্রীন পিজন অথবা সমুদ্রের কাঁকড়া…একটা না একটা আমিষ রান্না করতে হবেই। মাংস ছাড়া কর্ত্তার একটি বেলারও খাওয়ার আনন্দ ধন্য হয় না।

—অদ্ভুত মানুষ!

—একটু অদ্ভুতই বটে।

—বিয়ে করে শেষে এই লাভ হলো?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।···একটু বসো তপতী, মাংসটাকে ভিজিয়ে রেখে আসি।

চেঁচিয়ে ওঠে তপতী—ছিঃ এ কি করছিস তুই? আমি যাই, তারপর না হয়···।

—না ভাই; আজ খরগোসের মাংস এসেছে। দই আর নেবুর জলে এখনই ভিজিয়ে না রাখলে পরে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে; মাংস একটুও গলবে না।

—তুই মরেছিস। বেশ রাগ করে কথাটা বলে দিয়েই উঠে দাঁড়ায় তপতী।

—কি করবো বল? ভদ্রলোক খরগোসের মাংসের ভিন্দালু খেতে বড় ভালবাসেন।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু তোকে ভালবাসেন তো?

এইবার হেসে ফেলে সুমঙ্গলা—তা জানি না, কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

—আর জানতেও হবে না কোনদিন। সেই জন্যেই বলছি, তুই মরেছিস।

বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে সুমঙ্গলার কথাই মনে পড়েছিল তপতীর; এ কিরকমের একটা ছন্নছাড়া জীবন সহ্য করছে সুমঙ্গলা? তপতী জানে, অনিমেষের সঙ্গে এক বছরের দেখা-শুনা আর ভালবাসার পর সুমঙ্গলা অনিমেষকে বিয়ে করেছিল। কে জানে কি দেখে আর কি জেনে ভালবেসেছিল সুমঙ্গলা? যে দুজনের জীবনের সাধ ইচ্ছা আর অভিরুচির মধ্যে এত অমিল, তাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসাই বা হয় কেমন করে। ভাল করে না

জেনে-শুনে আগে থেকে ভালবেসেই বা ফেলে কেমন করে? কি ভয়ানক ভুল! আর সে ভুলের শাস্তিটাও এমন চতুর রকমের কঠোর যে, শাস্তির বেদনাটুকুও বুঝতে দিচ্ছে না। এমন বিয়ে করে লাভ হলো না ক্ষতি হলো, সুমঙ্গলার প্রাণে এটুকু বিচার করবার মত শক্তিও যেন নেই।

জীবনের এই শাস্তির ভয়টারই জন্যে তপতীর ভালবাসার মন ভীরু হয়ে আছে। সত্যি কাউকে ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু এই ভয়টুকুরই জন্য তপতীর প্রাণটা এত সাবধান। ইচ্ছেই তো করে মন-প্রাণের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে একজনকে ভালবাসি। এমন ভালবাসার মানুষকে যেন ভোরের ঘুমের স্বপ্নের মধ্যে এক একদিন দেখতেও পাওয়া যায়। তপতীর প্রাণের সব ইচ্ছা আর সব সাধের সঙ্গে সে মানুষের সব ইচ্ছা আর সাধ যেন মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। দু'জনের চোখের সামনে যেন একটা বই খোলা পড়ে আছে; আর দু'জনে পাশাপাশি মাথা রেখে একই সঙ্গে তাকিয়ে আর দু'চোখে একই তৃপ্তির আবেশ নিয়ে একই পাতার লেখা পড়ছে।

দু'জনে দুজনের হাত ধরে রয়েছে। দু'জনের বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের ছন্দের মধ্যেও কোন অমিল নেই। দু'জনের অনুভবের আনন্দও যেন একটি ঢেউ হয়ে দুলছে।

ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর স্বপ্নের এই ছবিটাকে অনেকক্ষণ ধরে যেন জাগা চোখেও দেখেছিল তপতী। দেখতে ভাল লাগছিল। এই স্বপ্নটা যেন একটা সান্ত্বনা। সত্যিই যে একেবারে ছবি এঁকে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল স্বপ্নটা, সত্যিই মনের মত মানুষ হলে তাকে ভালবাসতে এক মুহূর্তও দেরি করতে হয় না। ভালবাসা কত সহজ হয়ে যায়।

ভালবাসতেই তো চায় তপতীর জীবন; পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের

এই মনটা আজও স্বপ্ন দেখিয়ে দিয়ে তপতীর ইচ্ছাটাকে তপতীর কাছে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে। কলকাতার মাসিমারা, পিসিমারা, হরেনকাকা, আর ছোড়দাও ঠিক বুঝতে পারেন নি, বরং উল্টোটাই বুঝলেন। তপতী একটা বিয়ে-বিদ্রোহিনী মেয়েলি চেহারা মাত্র নয়; বিয়ে করতেই চায় তপতী। ভালবেসে সুখী হওয়ার জন্যে একটা মেয়েলি পিপাসা তপতীর এই সুন্দর সুশ্রী আর সুসজ্জিত রক্ত-মাংসের অস্তিত্বের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

আরও আশ্চর্য, এবং সে আশ্চর্যের লজ্জাকে নিজের মনের কাছে আর ফাঁকি দিয়ে লুকোতে চেষ্টা করে না তপতী। মুখ লুকানো এই পিপাসাটা মাঝে মাঝে সত্যিই যে ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে; আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই শান্ত সাবধান প্রাণটাকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে।

এই তো সেদিন, ছোড়দা চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় চলে যাবে, এই খবর শুনতে পেয়ে নিরুদি যেদিন এলেন, সেদিন কি যেন কি ভেবে আর বেশ গম্ভীর হয়ে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললেন—সত্যিই; তুই আর বিয়ে করলি না দেখছি।

নীরুদির কথার মর্মটুকু বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে নেই। তিনি ধরেই নিয়েছেন, তপতীর আর বিয়ে হবে না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পার করে দিয়েও কোন মেয়ে বিয়ে করতে পারে, এটা যেন নিতান্ত অপার্থিব একটা অঘটন।

তপতী কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ স্বরে, কোন কুণ্ঠা আর লজ্জার ধার না ধেরে বলে দিতে পারে—তুমি এত হতাশ হয়ে গেলে কেন নিরুদি; আমি তো একটুও হতাশ হইনি।

নিরুদি—এখনও হতাশ না হলে আর হবি কবে? চুলে পাক ধরবার পর? না, তখনও হতাশ হবি না?

—বলতে পারি না। হেসে হেসে জবাব দেয় তপতী।

নীরুদি চোখ বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই বিড়বিড় করেন—কে জানে হিষ্ট্রির মধ্যে কোন জ্ঞানের আলো পেয়েছিস, যে জন্যে···থাক্, অধ্যাপিকার সঙ্গে তর্ক করবার সাধ্যি অন্তত আমার নেই।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সত্যটাকে যেন ভুলেই বসে আছে তপতী, কিংবা সে সত্যটাকে নিয়ে তপতীর চিন্তায় কোন প্রশ্নের বালাই নেই। নীরুদি মনে করিয়ে দিয়েছেন বলেই মনে পড়েছে তপতীর, বয়সটা পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। বয়সের হিসাব করবার কোন অভ্যেসও নেই তপতীর। বরং ভাবতে একটু বিশ্রীও লাগে, নীরুদির মত মানুষেরা বুঝতেও পারেন না যে, বয়সের কথা তুলে তাঁরা বিয়ে আর ভালবাসার ব্যাপারটাকে কত ছোট করে দিচ্ছেন। বিয়ে আর ভালবাসা যেন শুধু বয়সের গুণ দেখবার কাজ, বিয়ে করা যেন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। বয়সের কথা বললে যে শরীরটারই কথা বলা হয়, নিতান্ত স্থূল আর অশোভন একটা ইঙ্গিত করা হয়। সত্যি কথা হলেও বিয়ে-করা ভালবাসার জীবনে সেটাই সব চেয়ে বড় সত্য কিংবা একমাত্র সত্যের কথা নয়। আর, কোন মেয়ের জীবনে সে ইচ্ছেটা প্রাণেরই পিপাসার মত হলেও সেটা এমন পিপাসা হতে পারে না, অন্তত হওয়া উচিত নয় যে, যে-কোন ডোবার জলের কাছে ছুটে যেতে হবে। যেন সূর্য ডুবে গেল, বয়স দেখে এরকম একটা আতংক নিয়ে তাড়াহুড়ো করাও কোন মেয়ের জীবনের পক্ষে সম্মানের কথা নয়, কাণ্ড-জ্ঞানেরও কথা নয়। বাজে বিয়ের চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।

এত কথা নীরুদিকে বলতে পারে না তপতী। তাই নীরুদিও বোধ হয় তপতীকে ভুল বুঝে কিংবা কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু আশ্চর্য হয়ে চলে গেলেন!

নীরুদি চলে যাবার পর কিন্তু তপতীর মনটা নিজেরই একটা গোপনতার লজ্জায় অনেকক্ষণ ধরে বেশ কষ্ট পেয়েছিল। কিছুই বুঝতে না পেরে কিংবা ভুল বুঝে চলে গেলেন নীরুদি, এর জন্য দায়ী তপতীরই একটা মিথ্যে লজ্জা। আর গোপন করবার কি দরকার ছিল? নীরুদিকে মুখ খুলে কথাটা বলে দিলেই তো কত খুশি হয়ে, আর, নিশ্চয় একটা আশীর্বাদও করে চলে যেতেন নীরুদি। নীরুদি নিজেই বুঝে লজ্জিত হতেন যে, তপতীর বিয়ে হলো না বলে এতটা হতাশ হওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় ভুল হয়েছে। আর, ওভাবে হতাশার কথাটা বলে ফেলাও কত অন্যায় হয়েছে। বলে দিলেই তো হতো, না নীরুদি, একটুও হতাশ হবেন না, বোধহয় ছত্রিশ বছরের বয়সটাও পার করে দেবার আর সুযোগ হবে না, তার আগেই একদিন তোমাকে এসে বিয়ে ভীরু তপতীর মাথায় ছোট্ট একটা লাজুক আনন্দের ঘোমটা চড়িয়ে দিতে হবে।

ঠাট্টার হাসি হেসে আর বাজে কথা বলে নীরুদিকে ভুল বুঝিয়ে দেবার সময়েও যার কথাটা বার বার মনে পড়েছিল তপতীর, তার নাম সুললিত। নীরুদি শুনে খুবই খুশি হতেন, কারণ সুললিত হলো নীরুদিদেরও চেনা মানুষ। কেম্ব্রিজের পড়া সাঙ্গ করে, প্রায় পাঁচ বছর লণ্ডনেরই একটা ব্যাঙ্কে অডিটারের কাজ করে, এই বছর দেশে ফিরেছে সুললিত। এরই মধ্যে ইমপোর্ট কন্ট্রোলের একটা ভাল মাইনের সার্ভিস নিয়ে কলিকাতাতেই আছে। নীরুদির স্বামী বিকাশবাবুর সঙ্গে সুললিতের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। খুব মনে পড়ে তপতীর, নীরুদির মুখে সুললিতের নামটা প্রথম শুনেছিল তপতী। সে প্রায় এক বছর আগের কথা। চোখ অপারেশন করবার জন্যে বিকাশবাবু লণ্ডনে যেতে চান। ভাগনে সুললিত লণ্ডন থেকে লিখেছে, চলে

আসুন, কোন চিন্তা করবেন না। লণ্ডনে সুললিতের এক ডাক্তার বন্ধু আছেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে।

সেই সুললিতের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হবে ; তপতীর প্রাণটা যেন অনেক দিনের ঘুমের পর নতুন হয়ে জেগে উঠেছে। তপতী নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, সুললিত যেন তপতীর মাঝে মাঝে দেখা সেই স্বপ্নের মানুষটিরই মত একেবারে মনের মত মানুষ। যদিও মাত্র ছ'মাসের পরিচয়, কিন্তু তপতীর মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সুললিতকে বুঝতে কোন ভুল হয়নি তপতীর। আজ পর্যন্ত দু'জনের আলাপের আনন্দ কোন তর্কের আঘাতে ছিন্ন হয়নি ; কোন তর্কই ওঠেনি। দু'জনেরই মনের মত যত সাধ ইচ্ছা আর অভিরুচি, যত মত মতবাদ আর সংকল্পের মধ্যে কোন অমিল নেই যেখানে, সেখানে তর্ক দেখা দেবেই বা কেমন করে ? বিলেতে জীবনের দশটা বছর পার করে দিলেও বিলেত সম্বন্ধে সুললিতের মনে কোন ভক্তিবিহ্বলতা নেই। বিলেতে না গিয়েও তপতীর মনে বিলেত-প্রীতির ছিটেফোঁটাও নেই। সুললিত বরং মাঝে মাঝে বিলেত সম্বন্ধে একটা অভক্তির ভাবই প্রকাশ করেছে—বিলেত দেশটাও মাটির। তপতীও খুশি হয়ে বলেছে, আমার মনে হয়, মাটিটাও বিশেষ সুবিধের নয়।

—আপনি আন্দাজে ঠিকই ধরেছেন মিস মল্লিক। বিলেতের মাটির অনেক গুণ থাকলেও, ভারতীয় বেচারাদের যেন বেশ একটু কামড়ায়। চাকরিটা ভালই ছিল, অনেকের কাছ থেকে অনেক শিখেছি আর উপকার পেয়েছি। সবই সত্যি। কিন্তু ভারতীয় বেচারাদের সম্পর্কে ওদের যেন একটা প্রভু-প্রভু ভাব আছে ; ভাল ব্যবহারের মধ্যেও সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন ধরুন, পঁচিশ বছর বয়সের এক লেখিকা, নামটা বোধ হয় হানা নিকলসন, একদিন বি. বি. সি'র অফিসে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেই চট্ করে বলে ফেললেন—আমার খুব বিশ্বাস, আপনাদের ভারতীয় সাহিত্যও

একদিন বেশ উন্নত হবে, আর এইরকম একটি উপন্যাসও সৃষ্টি করতে পারবে।

তপতী—কি রকম উপন্যাস?

সুললিত—লেখিকা মহোদয়া তাঁর নিজেরই লেখা একটা উপন্যাসকে হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এইরকম উপন্যাস।

তপতীর হাসিটাও গম্ভীর হয়ে যায়—এধরণের অহংকারের জন্যেই তো ওদেব একটুও ভাল লাগে না!

সুললিত—আপনি কাদের কথা বলছেন?

তপতী—আপনি যাদের কথা বলছেন তাদেরই কথা। আমাদের কলেজে পড়াবার স্টাফে সবশুদ্ধ দশজন বিদেশী মহিলা আছেন। সকলেই ইউরোপীয়ান; তার মধ্যে একজন হলেন ইংরেজ, যার নাম মিস মলিসন। সকলেই আমার হাত ধরে কথা বলেন, একমাত্র উনি অর্থাৎ মিস মলিসন ছাড়া। লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বাঁ হাতে ধরা বইটাকে ডান হাতে তুলে নেন, যেন আমি তাঁর ডান হাতটাকে খালি না পাই। পাছে ধরে ফেলি, এই তাঁর ভয়!

সুললিত—ওটা ঠিক ভয় নয়, ওটা হলো এক ধরণের ঘৃণা।

তপতীর গলার স্বর একটু রুষ্ট হয়ে ওঠে—ঘৃণা করবার এত স্পর্ধাই বা ওরা কোথা থেকে পায়, কে জানে? আমিও ঠিক করেছি, মহিলাকে একদিন একটু শিক্ষা পাইয়ে দেব। সে সুযোগ পাওয়া যাবেই।

সুললিত হাসে—আপনি কি পাল্টা কোন প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছেন?

তপতী—হ্যাঁ?…একরকমের প্রতিশোধই বলতে পাবেন।

সুললিত—কি করবেন আপনি?

তপতী—বুঝিয়ে দেব, আমিও ইংরেজ জাতকে কত ঘেন্না করি।

—কি করে বোঝাবেন?

—যেদিন কোন ভুলে, ভুলে কেন নিজেরই কোন স্বার্থের মতলবে উদার ভদ্রতার ভান করে আমার দিকে যখন হাত বাড়িয়ে দেবেন মিস মলিসন, আমি তখন হাত গুটিয়ে শুধু মুখের কথায় যা বলবার হয় বলবো।

—এটা কি প্রতিশোধ নেওয়া হলো ?

—কি বললেন ?

—এটা প্রতিশোধ নেওয়া হলো না ; এতে আপনি শুধু নিজেকেই একটু ছোট করে দিলেন।

চমকে ওঠে তপতী : আর, সুললিতের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে, যেন নিজেরই মনের একটা বিস্ময়ের চকিত মুগ্ধতা নিক্ষেপ করে, অন্যদিকে মুখ ফেরায় তপতী। না, অমিল নয়, সুললিত আপত্তির সুরে যে কথাগুলি বলছে, সেগুলি যে তপতীরই অভিরুচির কথা। তপতীর মনের ভিতরে কতবার একটা চাপা বিক্ষোভের রাগ যেন জল্পনা করেছে ; মিস মলিসনের মত জাতগর্বিতা মহিলার স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেকটাকে একটু জব্দ করে দেওয়া, একটু শিক্ষা দিয়ে দেওয়াই উচিত। সাহেবের দোকানের জিনিসপত্রকে সারদা পিসিমা গঙ্গাজল ছিটিয়ে যে-রকম শুদ্ধ করে নিয়ে তবে স্পর্শ করেন, ঠিক সেরকম না হোক, ইচ্ছে করলে প্রায় সে রকমই একটা ব্যবহার একটু ভদ্রভাবে করতে পারা যায়। মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখের উপর রুমাল চেপে আর মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কথা বলা যায়। মিস মলিসনের অহংকার তাহলে বেশ জব্দ হয়ে যায়। কিন্তু...মনের ভিতরে এধরণের জল্পনার কাণ্ড দেখে তপতী নিজেই লজ্জিত হয়েছে। এই জল্পনা যে মিস মলিসনের হাতের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হবার জন্য একটা লোভের কান্না। দরকার কি, নিজেকে এত ছোট করে দেওয়া ?

কি আশ্চর্য সুললিতের মনের কথাগুলি যে তপতীরই প্রাণের

কথা। তপতীর একটা রাগী ইচ্ছাকে নিন্দে করেছে সুললিত, কিন্তু এই নিন্দেই যে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সুললিতের মার্জিত অভিরুচিটা হুবহু তপতীরই মার্জিত অভিরুচির মত।

চেঁচিয়ে কথা বলে না, বোধ হয় বলতেও পারে না সুললিত। তাই তপতীর প্রাণের একটা উদ্বেগও শান্ত হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে কথা বলবার মানুষকে সহ্যই করতে পারে না তপতী। মানুষের মুখে চেঁচানো কথা শুনলেই মনে হয়, যেন একটা রূঢ় রাক্ষুসে ভাব, একটা অমার্জিত ইতরতা কথা বলছে। সেই জন্যে নীরুদির স্বামী বিকাশবাবুকে দেখলেই সভয়ে সরে যেতে হয়। ভদ্রলোক একটা সাধারণ কুশল জিজ্ঞাসার কথাকেও যেন হুংকার দিয়ে বলেন। নীরুদির একবার খুব শখ হয়েছিল পুরী বেড়াতে যাবেন। সমুদ্র দেখবেন। বিকাশবাবুও খুব খুশি হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন, আর পুরীর সমুদ্রের সৌন্দর্যও বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু বিকাশবাবুর মুখে সমুদ্রের সেই বর্ণনা এমন চিৎকার আর হুংকার দিয়ে উঠলো যে, নীরুদি সমুদ্র বেচারাকেই ভুল বুঝলেন। নীরুদির পুরী বেড়াতে যাবার ইচ্ছাটাই মরে গেল। একদিন এমন কথাও বলেছিলেন নীরুদি—না, ও ছাই সমুদ্র দেখে লাভ কি? কি আছে দেখবার মত? তার চেয়ে ডালহাউসি যাওয়াই বোধ হয়…।

সুললিত দশ বছর বিলেতে কাটিয়ে দিলেও আমিষ খাওয়া পছন্দ করে না। এমন কি বিলেতে থাকতেও, প্রায় গান্ধীজীরই মত নিরামিষ খাবার খেয়েছে সুললিত। জানতে পেরে তপতীরও প্রাণের একটা ভয় দূর হয়ে গিয়েছে। মাংসের নাম শুনলেই যেন আতংক বোধ করে তপতী। সেই যে কবে, নিতান্ত ছেলেবেলায়, মা তখনও বেঁচে ছিলেন, মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল তপতী, তারপর আর কোনদিন মাছ মাংস স্পর্শ করেনি। যে যতই যুক্তি দেখাক না কেন, মাছ মাংস খাওয়া যে একটা সুস্বাদু নিষ্ঠুরতার কালচার, এই

সংস্কারটাকে আজও মন থেকে বিদায় দিতে পারেনি তপতী; বরং সংস্কারটা এখন একটা কঠিন বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে বেশ বিপদে পড়তে হয়। এই সেদিনও রমা মাসিমার বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে তপতীকে দুঃসহ একটা শাস্তি সহ্য করিতে হয়েছিল। তপতী যত আপত্তি করে, না মাসিমা, আমাকে মাংস দেবেন না, আমি মাংস খাইনা পছন্দও করিনা; রমা মাসিমা ততই জেদ করেন আর মাংসটার মহিমা বর্ণনা করেন। —আজে বাজে জানোয়ারের মাংস নয় তপতী, একটু খেয়ে দেখ। রোড আইল্যাণ্ড মুর্গীর মাংস। বাড়িতে পোষা রোড আইল্যাণ্ড। উনি নিজে ব্যাণ্ডেলে গিয়ে এক সাহেবের পোল্ট্রি থেকে খাঁটি জাতের রোড আইল্যাণ্ডের এক ডজন ডিম এনেছিলেন; কত চেষ্টা করে একটা দেশী মুর্গীকে দিয়ে সেই ডিম ফুটিয়ে, তারপর কত যত্ন করে ছানাগুলোকে লালন-পালন করা হয়েছে। উনি সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা নিজের হাতে ছানাগুলোকে বিলিতী যবের দানা খাইয়েছেন। কী সুন্দর টুক-টুক করে যবের দানা খেত ছানাগুলো। ওঁকে দেখলেই ঠোঁট ফাঁক করে দানা চাইতো লোভীগুলো। এক ডজন ডিমের মধ্যে ফুটেছিল মাত্র ছটা; তাও আবার বড় হতে হতে পাঁচটাই মরে গেল। বাকি ছিল শুধু একটা—এটাই হলো সেটা। কী চমৎকার চকচকে পালক হয়েছিল! কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাত সাড়ে চারটায় সময় ডাক দিত। ওরই একটা টেংরি, একবার টেস্ট করে দেখ তপতী।

ভয় পেয়ে খাবার টেবিল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তপতী। রমা মাসিমা আর···আরও যারা ছিল, তারা হো হো করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু তপতী বাড়ি ফিরে এসেও অনেকক্ষণ ধরে আতঙ্কিতের মত চুপ করে বসেছিল। মাংসের কথা নয়, রমা মাসির মুখটা আর সেই হো হো হাসির শব্দটা মনে পড়ছিল বারবার।

স্থলিত বলেছে—জীবনে আমিও হ্যাপিনেস চাই; কিন্তু হ্যাপিনেস বলতে যা বুঝি, সেটা গাদা-গাদা টাকা-পয়সা খ্যাতি ক্ষমতা আর পপুলারিটি নয়। আমি বুঝি, শান্তি মানেই হ্যাপিনেস। চুপচাপ কাজ করে, কারও সামান্য ক্ষতিও না করে, মনের মত মানুষের সঙ্গে মনের কথা বলে জীবনটা যেন পার করে দিতে পারি। মনের শান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো, আর মনের শান্তি নিয়ে জেগে উঠবো···বাস, এর চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্খা নেই।

তপতীও যে এর চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্খা করে না। যেখানে ভালবাসা শান্তি এনে দিতে পারে, সেখানেই যে ভালবাসা উৎসর্গ করে দিতে চায় তপতী। আর কোন সন্দেহও নেই তপতীর; স্থলিতের মত মানুষকে ভালবাসতে না পারবার কোন কথা নেই। দু'জনের জীবনের ইচ্ছা রুচি আর দাবির মধ্যে একটুও অমিল নেই।

হরেন কাকাকে যে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, না, আর ভুল বুঝবেন না। আর ওভাবে অনুরোধ করবার দরকার নেই। আপনাদের তপতীর এতদিনের সাবধান জীবনটা এইবার সব ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। এবার আপনিই একবার স্থলিত বাবুকে স্পষ্ট করে বলে দিন যে, তপতীর আপত্তি নেই।

কিন্তু এত কথা বলবার লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য সামান্য একটা কথা বলে হরেনবাবুকে আশ্বস্ত করতে চায় তপতী। তবুও বলতে গিয়ে সারা মুখে চঞ্চলতা শিউরে ওঠে। মাথা হেঁট করে তপতী!
—আপনি আর চিন্তা করবেন না কাকাবাবু। শিগগির দেখতে পাবেন···মনে হচ্ছে যে···।

হয়তো আরও স্পষ্ট করে একটা কথা বলে দিত তপতী। কিন্তু হরেনবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন
—ও কে আসছে? স্থলিত বলে মনে হচ্ছে।

তপতীর মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে। আস্তে আস্তে একটু বিব্রত আর কুণ্ঠিত স্বরে বিড়বিড় করে—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

হরেন বাবুর চোখ দুটোও যেন হঠাৎ উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠে। বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। আমি এখন তাহলে আসি তপতী।

॥ ২ ॥

সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দুটি বাড়ি আজও তেমনই দুটি ভিন্ন রকমের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ভবতোষ মল্লিকের বাড়ি, আর হরেন দত্তের বাড়ি। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা যেন একটা নীরবতার সৌধ; আর হরেন দত্তের বাড়িটা মুখরতার মার্কেট। এবাড়িতে শুধু তপতী নামে একটা প্রায়-স্তব্ধ প্রাণ; আর ওবাড়িতে বিশটি ভাড়াটিয়া পরিবারের দিনরাত্র চেঁচামেচির প্রাণ।

সেই হরেন বাবু, সত্তর বছর বয়সের যে মানুষটি হনহন করে হেঁটে বেড়াতে পারতেন, তিনি এখন সাতাত্তর। হনহন করে না হোক্, এখনও বেশ ব্যস্তভাবে হাঁটতে পারেন, এবং হাতে লাঠি না থাকলেও চলে, যদিও একটু কুঁজো হয়ে চলতে হয়।

মাঝখানে পুরো তিনটি বছর কার্সিয়ং-এর এক নার্সিংহোমে ছিলেন হরেনবাবু। কে জানে কেন, কলকাতাকে হঠাৎ বড় দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল। কার্সিয়ং-এর ডাক্তারও আশ্চর্য হয়ে বলেছেন। আপনার এই বুড়ো শরীরের স্বাস্থ্যেও কোন ত্রুটি দেখছি না। মনে হয়, অসুখটা আপনার শরীরের নয়, মনের।

—তার মানে?

—মনের বিমর্ষতাই আপনার একমাত্র অসুখ।

—তা হবে।

কার্সিয়ং-এর জল-হাওয়া ভাল লেগেছে। শরীরটারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাতে লাভ কি? মনের শান্তিটার যে সত্যিই কোন উন্নতি হয়নি। ঠিকই বলেছে ডাক্তার।

কার্সিয়ং থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন হরেনবাবু, সেও প্রায় এক বছর হলো। আবার বিমর্ষ হয়েছেন। আবার মনে মনে তৈরী হয়েছেন, কার্সিয়ং-এর নার্সিং হোমই ভাল।

কিন্তু কলকাতার জীবনটাকে দুঃসহ মনে হয়ই বা কেন? সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন হরেনবাবু। কিন্তু সেটা এমন একটা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা যে, কাউকে বলা যায় না; বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এমন কোন বান্ধবও নেই, যার কাছে সে-কথা বলা যেতে পারে। বেঁচে থাকতো যদি ভবতোষ, হাঁ হরেন বাবুর বৃদ্ধ বয়সে জীবনের সেই একটি মাত্র অশান্তির বেদনা যেন তাঁর মনের ভিতরে আজও নীরবে বিড়বিড় করে, তুমি কী আশা করেছিলে ভবতোষ, আর কী হলো? আমি থেকেও কিছুই করতে পারলাম না। তোমার বাড়িটা যে পুরনো উজ্জয়িনীর জঙ্গলের ভিতরের সেই ভাঙ্গা প্রাসাদটার মত নিঝুম; মানুষের সাড়া নেই।

ভবতোষের বাড়ির এই নিঝুম চেহারাটা সহ্য করতে পারেন না হরেনবাবু, একথা কাউকে বললে, সে যে হরেনবাবুর মাথায় রোগ আছে বলে সন্দেহ করবে কিংবা হো হো করে হেসে উঠবে, একথা জানেন হরেনবাবু।

নিজেকেও প্রশ্ন করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, ভবতোষের বাড়ির এই জনহীন স্তব্ধতা সহ্য করতে তিনি পারবেনই বা না কেন?

হাঁ, মনে পড়ে, নিজেরই বাড়ির একটা স্তব্ধতাকে একদিন কি-ভয়ানক দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল। সেই সেদিন, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ভবতোষের এই বাড়িটা তখনো তৈরী হয়নি, হরেনবাবুর নতুন বাড়িটার প্রথম চুনকাম তখন ধবধব করছে, সেই যে পূর্ণিমা একদিন সকালবেলায় প্রণাম করে হাসপাতালে চলে গেল, আর সন্ধ্যাবেলাতেই হাসপাতাল থেকে খবর এল যে,

পূর্ণিমা আর ফিরবে না। শূন্য, স্তব্ধ, একেবারে বোবা হয়ে গেল বাড়িটা। সেই বোবা স্তব্ধতা যেন হরেনবাবুর প্রাণ আর প্রাণের একটা আশার ছবিকে পিষে পিষে গুঁড়ো করে দিয়েছিল।

হাসপাতালে গেল পূর্ণিমা, ফিরে আসবে হরেনবাবুর ছেলেকে কোলে নিয়ে; নতুন বাড়িটার প্রাণ এইবার সত্যিই নতুন হয়ে জেগে উঠবে। শ্বেতপাথরের রাজপুরী হোক, তিন মহল অট্টালিকা হোক, আর মাটির কুটীরই হোক, একটা বাচ্চা ছেলে যদি আঙ্গিনায় বা বারান্দায় ঘুর ঘুর না করে, তবে যে বাড়িকে বাড়ি বলেই মনে হয় না। সে বাড়িকে একটা শুকনো অফিস-বাড়ি বলে মনে হবে। আজও কি ভুলতে পেরেছেন হরেন বাবু, পূর্ণিমা হাসপাতালে যাবার আগেই তিনি পিছনের বাগানে একটা ছোট আমগাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে ছোট্ট একটা দোলনা ঝুলিয়েছিলেন, আর ছোট্ট একটা কাঠের ঘোড়াও কিনে এনে রেখেছিলেন?

পূর্ণিমা আর আসবে না; মরা ছেলেকে পেটে নিয়ে পূর্ণিমা মরণ বরণ করেছে। পূর্ণিমা আর কোনদিনই হরেন দত্তের আশার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এবাড়িতে আসবে না। কিন্তু বাড়িটাকে এই ভয়ানক শূন্যতার অভিশাপ থেকে তো বাঁচাতে হবে। বাড়ির প্রত্যেক ঘর ভাড়া দিয়ে দিলেন হরেনবাবু।

কিন্তু ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকের বউ বেচারী যে সত্যিই কচি ছেলে কোলে নিয়ে এবাড়িতে ঢুকেছে। দেখতে বেশ লাগে। পঞ্চাননবাবু তিনটি ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন এসে এই বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিলেন, সেদিনের সে ঘটনাও মনে পড়ে। হরেন বাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কত মাইনে পান?

—এক শো দশ টাকা।

—সর্বনাশ। তার মধ্যে তিরিশ টাকা যে বাড়ি ভাড়া দিতেই লেগে যাবে মশাই?

—কি আর করবো বলুন ? আপনি তো একটা টাকাও কম নিয়ে ছাড়বেন না।

—কে বললে ছাড়ব না ? আপনি কুড়ি টাকা ভাড়া দেবেন।

ভাড়াটিয়া মানুষগুলিও এতদিনে ভাল করে চিনতে পেরেছে এই হরেনবাবুকে। মহালয়ার দিন এই বাড়ির পঁচিশটা কাচ্চা-বাচ্ছা-ছেলে-মেয়ে উপরতলার দাদুর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সোর-গোল করে একটা দাবিও হাঁকে—পূজোর উপহার দাদু।

হরেনবাবু ঘর থেকে বের হয়ে শুধু ওদের বয়সের চেহারা-গুলিকে একবার দেখে নেন। তারপর সেদিনই সন্ধ্যা বেলায় বাড়ির সব বারান্দায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের হুল্লোড় জাগে। সবারই জন্য নতুন জামা প্যান্ট আর ফ্রক কিনে এনেছেন দাদু।

গোপনে আরও একটা কাণ্ড করে রেখেছেন হরেনবাবু, যার খবর হরেনবাবুর কোন আত্মীয় মানুষও জানে না। এই পাড়ার কোন মানুষও না। এই কাণ্ডটাও হরেনবাবুর জীবনের একটা হঠাৎ বেদনার সৃষ্টি। বড় দুঃসহ হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই বেদনা, কারণ আঘাতটাও ছিল বড় কঠোর।

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে, কনকনে শীতের একটা কুয়াশা-ভরা ভোরে, সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দক্ষিণের ঐ বস্তিটারই কাছ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলেন হরেনবাবু। একটা ঘরের কাছে ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

—কি ব্যাপার ?

—একটা বাচ্চা পড়ে আছে বাবুজী। এক মাসের একটা বাচ্চা। উত্তর দিল যে, তাকে চিনতে পারেন হরেনবাবু, কয়লাওয়ালা রামপূজনের মা।

—কিস্‌কা বাচ্চা ? প্রশ্ন করে ভিড়ের আরও কাছে এগিয়ে যান হরেনবাবু।

—শিশিওয়ালা কিষণের বউ জগমতিয়ার বাচ্চা।

শিশিওয়ালা কিষণ আর কিষণের বউ জগমতিয়া, দু'জনেই পালিয়েছে। ঘরের দরজা খোলা পড়েছিল; তাই বস্তির মানুষ এই ভোরেই দেখতে পেয়েছে, বাচ্চাটা এক টুকরো চটের ওপর পড়ে আছে আর কাঁদছে।

ভিড়ের একটা লোক বলে ওঠে—থানামে লে যাও।

—কেন? প্রশ্ন করেন হরেনবাবু।

—বাচ্চাকো লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেহি বাবু।

—না, থানামে নয়। হরেনবাবু বিচলিত স্বরে কথা বলেন।

—তবে কহাঁ?

—বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে কেউ একজন আমার সঙ্গে চল। এখনই চল।

চিন্তা করবার কিছু ছিল না। সার্কাস অ্যাভিনিউ এর উপরে ঐ যে লালরং৷ এত-বড় একটা বাড়ি; ওটা একটা অনাথ আশ্রম। নাম—লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্স। হরেনবাবু জানেন, অনাথ শিশুদের কী সুন্দর যত্ন নিয়ে লালন-পালন করে এই লিটল্ ফ্লাওয়ার্স। এই চমৎকার স্নেহের কাজটা করেন যাঁরা, তাঁদের মুখের হাসিও চমৎকার। ইউরোপের এক বিখ্যাত চার্চের অনুগত এক ভক্তগোষ্ঠীর এক ফাদার আর তাঁর সহায়িকা এক মাদার, একদল দেশী চাকর চাকরানি নিয়ে দিনরাত খেটে এই অনাথ শিশুর আশ্রমটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্সের লালরঙা স্নিগ্ধ মূর্তিটার দিকে মাঝে মাঝে মুগ্ধভাবে তাকিয়েছেন হরেনবাবু।

কিন্তু সেদিন হরেন বাবুর সেই মুগ্ধ চোখের বিশ্বাস যেন হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাতের বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো। ফাদার বললেন—মাপ করবেন, আমরা একেবারে খাঁটি নেটিভ পেরেণ্টেজের কোন শিশুকে রাখি না। অন্তত মিক্সড্ ব্লাড হওয়া চাই।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আমাদের নিয়ম, শিশুর ফাদার ও মাদারের মধ্যে অন্তত একজন যদি অব ইউরোপীয়েন ওরিজিন হয়, তবে আমরা তাকে নিতে পারি।

আর কোন কথা না বলে বস্তিতে ফিরে এসে, আর কয়লাওয়ালা রামপূজনের মাকে একশো টাকা দিয়ে বাচ্চাটাকে একটা বস্তিরই নোংরা যত্নের কাছে গছিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলেন হরেন-বাবু। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যেন একটা ক্রুদ্ধ জ্বালাময় আগুনের উত্তাপও ছিল। সেই দিনই হরেনবাবু তাঁর এই বাড়িকে একটা পরিকল্পনার কাছে সঁপে দিলেন। পরদিনই ডীড তৈরী করে বাড়িটাকে ভবিষ্যতের হাতে দান করে দিলেন। সে দান রেজিষ্টারী করাও হয়ে গেল। হরেনবাবু যখন আর ইহজগতে থাকবেন না, তখন এই বাড়িটা একটা শিশু আশ্রম হয়ে যাবে, আর, নাম হবে 'পূর্ণিমার আলো'। দেশের সরকার হবেন সেই আশ্রমের অভিভাবক। হরেনবাবুর যে টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকবে, তার সবই হবে এই আশ্রমের সাহায্যের ফণ্ড।

কিন্তু হ্যাঁ, ডীডের মধ্যে একটা কঠোর নিয়মেব নির্দ্দেশ রয়ে গেল। 'পূর্ণিমার আলো'তে শুধু দেশী পিতা-মাতার শিশু ঠাঁই পাবে। শিশুর জন্মের মধ্যে ইউরোপীয় মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও থাকলে চলবে না; সে শিশুর ঠাঁই এখানে নয়।

বাড়ীর আয় অর্থাৎ ভাড়া বাবদে যা কিছু পান হরেনবাবু, তার সবই ব্যাঙ্কেব কাছে এই ভবিষ্যতের শিশু-আশ্রমের সাহায্য ফণ্ডের নামে জমা হয়। পেনসনের প্রায় অর্দ্ধেকও হবেনবাবুর স্বপ্নের সেই 'পূর্ণিমার আলো'র সাহায্যের জন্য প্রতি মাসেই ব্যাঙ্কের খাতায় নিয়মিতভাবে জমা হয়ে চলেছে।

তাই সড়কের উপর বেড়াতে বেড়াতে নিজের বাড়িটার দিকে

তাকাতে হরেনবাবুর চোখে আর কোন শূন্যতা ছলছল করে না। বরং, একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সুখ যেন হরেনবাবুর সে চোখের দৃষ্টিতে ছলছল করে। দীর্ঘশ্বাসও ছাড়েন; কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে আর একটুও উত্তাপ নেই; বরং, অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা।

কিন্তু ভবতোষের বাড়িটা দেখতে কষ্ট হয় এবং সে কষ্ট সহ্য করতে আর বোধ হয় রাজি নন হরেনবাবু। তাই কলকাতা ছেড়ে দিয়ে তিনটি বছর কার্সিয়ং-এর হোমে কাটিয়ে দিলেন।

ডাক্তার বলেছেন, বিমর্ষতাই হরেনবাবুর একমাত্র অসুখ। কিন্তু কেন বিমর্ষতা? বিমর্ষতা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভদ্রলোকও কিন্তু কারণটা ধরতে পারেন নি। ডাক্তারের মতে, বৃদ্ধ বয়সের একটা অসহায়তাবোধ থেকে এই বিমর্ষতা দেখা দিয়েছে।

অসহায়তাবোধ মোটেই নয়; ডাক্তারের অভিমত শুনে হেসে ফেলেছিলেন হরেনবাবু।

ডাক্তার কিছুই জানেন না, কিন্তু হরেনবাবু সন্দেহ করেন, ভবতোষের বাড়িটাই বোধ হয় তাঁর শেষ জীবনের প্রাণটাকে এরকম বিমর্ষ করে দিয়েছে। তপতীরই ব্যবহারে হরেনবাবুর একটি সাধের আশার ছবি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সুললিতকেও বিয়ে করলো না তপতী!

অমল গ্লাসগো থেকে, শ্যামল মিশিগান থেকে, আর বিমল জাকর্তা থেকে চিঠি লিখেছে—তপতী যেন এইবার বিয়ে করে হরেনকাকা। আর এভাবে একলা পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। বিয়ের পরেও ও বাড়িতেই থাকুক তপতী।

অমল শ্যামল আর বিমল এই কথাও লিখেছিল, বাড়ির স্বত্ব তপতীরই নামে রেজেষ্টারী করিয়ে দিন। কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবেন, সই করে দেব।

তপতীর নামে বাড়ির স্বত্ব রেজেষ্টারী করিয়ে আর সুললিতের

মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন বড় খুশি হয়েছিলেন হরেনবাবু। এইবার ভবতোষের বাড়ির শূন্যতা ঘুচবে। মৃত্যুর পর যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে ভবতোষ আর জয়া, তাদের আদরের নাতিকে কোলে নিয়ে তপতী গুনগুন করে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। কিন্তু নাতিটা ভয়ানক দুরন্ত; ঘুমনো দূরে থাকুক, হাত-পা ছুঁড়ে ছটফট করছে আর চেঁচাচ্ছে। হাসতে হাসতে চলে যাবে ভবতোষ আর জয়ার অশরীরী তৃপ্তিটা।

কিন্তু তপতীর বিয়ে হলো না।

কেন হলো না, এ প্রশ্ন নিজের মনে কয়েকবার দেখা দিলেও তপতীর কাছে সে প্রশ্ন কোনদিন উচ্চারণ করেননি হরেনবাবু। আর ইচ্ছেও করে না। এমন কি তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে হরেনবাবুর স্নেহাক্ত চোখের চাহনিটা আগের মত আর মায়াময়ও হয়ে উঠে না।

কদাচিৎ কখনো ভবতোষের এই বাড়িতে আসেন হরেনবাবু। বিষণ্ণভাবে তপতীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন, তার পরেই চলে যান। চলে যাবার ব্যস্ততা দেখে মনে হয়, শুধু ভবতোষের বাড়ির শূন্যতাকে নয়; তপতীর এই একলা পড়ে থাকা জীবনটাকে, একটা অর্থহীন কুমারীত্বের মিথ্যা গর্বকে সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন হরেনবাবু।

একদিন কথায় কথায় বলেও ফেললেন হরেনবাবু।—একটা লেখায় পড়লাম, রবিঠাকুর বলেছেন, আশি বছর বয়সটা একটা পূর্ণতা।

হেসে ফেলে তপতী—হ্যাঁ, মৃত্যুর একবছর আগে কবি এরকম একটা কথা বলেছিলেন।

হরেনবাবু—কিন্তু…।

তপতী—কি?

হরেনবাবু—আমার মনে হচ্ছে, সাতাত্তর বছর বয়সটাই একটা ধৃষ্টতা।

তপতীর মুখটা করুণ হয়ে যায়।—এরকম কথা কেন বলছেন কাকাবাবু?

হরেনবাবু—না, আর ঝুলে থাকবার কোন মানে হয় না। খুব ভাল হতো যদি এইবার সরে পড়তে পারতাম।

তপতীর চোখের দৃষ্টি এইবার যেন একটা সন্দেহের ভয়ে ভীরু হয়ে ওঠে।—আপনি যেন খুব হতাশ হয়ে এরকম কথা বলছেন।

—তা হতাশ হয়েছি বৈকি।

—আপনি বোধ হয়· ।

—বল, কি বলতে চাও?

—আপনি বোধহয় আমার কথা ভেবে খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন।

—হ্যাঁ।

—আমাকে আপনি খুব ভুল বুঝেছেন কাকাবাবু।

—ভুল বুঝেছি? একটু আশ্চর্য হয়ে তপতীর মুখের দিকে তাকান হরেনবাবু। সত্যিই কি মেয়েটাকে ভুল বোঝা হয়েছে? তপতীর মুখের উপরে সত্যিই যে একটা লজ্জালু আশার রক্তাভা সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বয়স কত হলো তপতীর? বেয়াল্লিশের কম তো নয়। তবু কি তপতী সত্যিই এখনো একটা আশার উৎসবের অপেক্ষায় দিন গুনছে?

হরেনবাবুর মনের আশা-হতাশার দ্বন্দ্বটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়; হরেনবাবুর চোখ দুটো মায়াময় হয়ে ওঠে। কারণ তপতী যেন সব কুণ্ঠা আর লজ্জার বাধা তুচ্ছ করে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, আপনার হতাশ হবার কোন কারণ নেই কাকাবাবু।

অনেকদিন পরে আজ ভবতোষের বাড়িতে বেশ মনভরা খুশি আর চোখভরা হাসি নিয়ে চা খেলেন হরেনবাবু। চলে যাবার

সময়, আজ বেশ সোজা হয়ে হাঁটতেও পারলেন। না, সাতাত্তর বছর বয়সটা ধৃষ্টতা হবে কেন ? না, আর কলকাতার বাইরে গিয়েও কাজ নেই। আবার কার্সিয়ং-এর হোমে গিয়ে একটা বছর কাটিয়ে দেবার যে ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, সে ইচ্ছাটাও যেন হরেনবাবুর আজকের একটা আশ্বাসের তাড়া খেয়ে দূরে সরে গিয়েছে।

ভবতোষের বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, পিছু ফিরে বাড়িটার দিকে আজ বেশ খুশি চোখেই তাকাতে পারলেন হরেনবাবু।

এই খুশির উপর অতিরিক্ত আর একটা বিস্ময়। একটা গাড়ি ছুটে এসে ফটকের কাছে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামছে বিহঙ্গভূষণ, হরেনবাবুরই সলিসিটর বন্ধু নেপাল বসুর ভাইপো।

হাত তুলে হরেনবাবুকে নমস্কার করে বিহঙ্গ—কেমন আছেন আপনি ?

—ভাল আছি। নেপাল কেমন আছে ?

—কাকা ভালই আছেন।

—তুমি এখন···।

— আমি এখানেই এসেছি। কাকিমা তপতীকে একবার দেখতে চেয়েছেন।

—কেন ?

বিহঙ্গ লজ্জিতভাবে হাসে—সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে···। আমি অবশ্য স্পষ্ট করে ··। না এখনই আমার পক্ষে কিছু বলা উচিত নয় কাকাবাবু। শিগগিরই সব জানতে পারবেন।

—ভেরি ওয়েল। হাঁটতে শুরু করেন হরেনবাবু। হরেনবাবুর বিস্ময়টাই যেন উদ্দাম হয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

বিহঙ্গ বলে—আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি কাকাবাবু ?

—নো, থ্যাংকস্। হাতের লাঠি দুলিয়ে টান হয়ে আর হন্-হন্ করে হেঁটে চলে যান হরেনবাবু।

॥ ৩ ॥

হরেনবাবু তবু বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বয়সটা প্রায় ধৃষ্টতার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তপতী কি কিছু বুঝতে পারে?

ক্ষুব্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে রেখে, আর আড়চোখে একটা কঠিন অবজ্ঞার ভাব শক্ত করে ধরে রেখে, তপতী যেদিন সুললিতের ছায়াটাকে এই বাড়ির ড্রইংরুমের দরজা থেকে চিরকালের মত সরে যেতে দেখেছিল, সেদিনের পর থেকে পুরো সাতটা বছরের আলো আর বাতাসের ছোঁয়া নীরবে সহ্য করে ভবতোষ মল্লিকের বাড়ির সাদাটে চেহারাটা বেশ ধূসর হয়েছে; কিন্তু তপতীর বয়সের চেহারাটা ধূসর হয়েছে বলে মনে হয় না। সেদিন যে ছিল পঁয়ত্রিশ, সে আজ বেয়াল্লিশ।

আয়নাতে তপতীর রূপসী প্রতিচ্ছবির শরীরটা আজও নিটোল ছন্দের তৃপ্তিতে ঢলঢল করে। দেখতে পায় না তপতী, বোধ হয় কোন সন্দেহও মনে জাগে না যে, এই প্রতিচ্ছবিটা বেয়াল্লিশ বছরের একটা মেয়াদের শেষ সুন্দরতার ছবি। তপতীর মনটাই নিশ্চয় বয়স ভুলে গিয়েছে; নইলে এই সামান্য সন্দেহটাও মনে দেখা দিত নিশ্চয়।

সুললিতের ছায়া সাত বছর আগেই তপতীর চোখের কাছ থেকে সরে গিয়েছে। তপতীর মনের কাছে সুললিত আজ আর একটা ছায়াও নয়। সুললিত অনেকদিন আগের শোনা একটা গল্প মাত্র। সে গল্পের আরম্ভটা ভাল, মাঝখানটাও ভাল, কিন্তু শেষটা? শেষটা আর সহ্য করতে পারেনি তপতী। কি-ভয়ানক অমিল। সুললিতের জীবনে যে এত বড় একটা কদর্যতা গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ভুলেও কোনদিন সন্দেহ করতে পারেনি তপতী। সুললিতের মুখে

মদের গন্ধ পেয়ে সেই যে চমকে উঠলো তপতী, তারপর থেকে আর নয়। সুললিতের মুখের দিকে আর তাকাতে পারেনি তপতী।

—মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় অসুবিধে হচ্ছে। আপনি এখন যদি ·। প্লীজ এখনি চলে যান সুললিতবাবু।

সুললিত বলেছিল—আমি যে আজ অনেক আশা করে, সত্যিই স্পষ্ট করে একটা আশার কথা বলবার জন্য এসেছি।

—না, কোন কথা বলবার দরকার নেই।

—তুমি কি কিছু সন্দেহ করে অর্থাৎ আমাকে একটা মাতাল-টাতাল মনে করে ক্ষুণ্ণ হয়েছ?

—প্লীজ, আর বেশি কথা বাড়াবেন না সুললিতবাবু।

—আশ্চর্য, এই সামান্য একটা ··এটা আমার সন্ধ্যাবেলার সামান্য একটা অভ্যাস মাত্র। সারাদিনের খাটুনির পরে সামান্য একটু··।

—না, আর কোন কথা বলবেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তপতী, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আড়-চোখের দৃষ্টিতে একটা কঠোর অবজ্ঞা ধরে রাখে, যতক্ষণ না সুললিত নিঃশব্দে চলে যায়।

তপতীর আশাটা শুধু লজ্জিত নয়; অপমানিত বোধ করেছিল। নিজের উপর রাগ করেছিল তপতী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকেও ক্ষমা করতে পেরেছিল। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে যে মানুষের, তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া যে একটা শাস্তি। একটা ঘৃণার সঙ্গে আপোষ করে যে বিয়ে করতে হবে, সে বিয়েতে দরকার নেই। সে বিয়ে জীবনের শান্তি কখনো হয়ে উঠতে পারে না। জেনেশুনে আর ইচ্ছে করে একটা ভয়ের কাছে নিজেকে অসাবধান করে দিতে পারা যায় না। তা ছাড়া, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, একটা ব্র্যাণ্ডিধন্য মানুষকে, সে মানুষ যতই গুণী মানুষ হোক্, ভালবাসতে

পারা যাবে না; তখন তাকে বিয়ে করার অর্থ হবে নিছক একটা কপটতা। মনটাই যখন আর রাজি নয়, তখন মনের বিরুদ্ধে জোর করবার কোন মানে হয় না।

আজ আরও মনে হয়, ভালই হয়েছে। জোর করে মনটাকে দুর্বল করে দিয়ে সুললিতকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে ভালই হয়েছিল। তাই আজ তপতীর জীবনের আশাটা হেসে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটাকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। গোপালবাবুর স্ত্রী—মাধবী কাকিমা যদি কলেজের মেয়েদের আঁকা ছবির এক্‌জিবিশনে সেদিন না আসতেন, তবে আজ আর বিহঙ্গবাবুর সঙ্গে···হরেনকাকা জানেন না, তপতী আজ মনে মনে রাজি হয়েই আছে। মাধবী কাকিমা শুধু একটা দিন ঠিক করবেন; আর, তপতী সেদিন একটা সুন্দর উৎসবের মধ্যে এই বিহঙ্গবাবুরই হাত ধরে ভালবেসে সুখী হবার একটা জগতে চলে যাবে।

স্বপ্নের আব্‌ছা স্মৃতির ছবির মত অনেক দূরের একটা অনুভবের ছবিকে হঠাৎ কেন যেন বারবার মনে পড়ে যায়। সেই কবে, যেন পূর্বজন্মের একটা জীবনে তপতীকে একটা বকুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই কে-যেন মুগ্ধ হয়েছিল আর খাতাভরে কবিতা লিখেছিল। বিহঙ্গও প্রায় সেইরকমের একটা কাণ্ড করেছে। তপতীকে দেখেছে আর শুধু সেই একটি দেখার মায়াতেই মুগ্ধ হয়েছে। মাধবী কাকিমা নিজের মুখেই তপতীর কাছে এই গল্প করে গিয়েছেন। বিহঙ্গ বলেছে, আমি ওসব খোঁজ-খবর করবার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যত ইতিহাস জানবার আর শোনবার ধার-ধারি না; পছন্দও করিনা কাকিমা। তপতী যদি রাজি হয়, ব্যস্, আমি রাজি হয়েই আছি।

তপতীর মনেও আর কোন ভয় নেই। বেশ সুশ্রী শিক্ষিত সুস্থ আর ভাল রোজগারের মানুষ, এই বিহঙ্গভূষণ কেন যে আজ পর্যন্ত

বিয়ে করেনি, যে প্রশ্নের উত্তরটাও মাধবী কাকিমা নিজেই গল্প করে তপতীকে শুনিয়ে দিয়েছেন।— বিহঙ্গর প্রতিজ্ঞা ছিল, কারবারে উন্নতি না করা পর্যন্ত বিয়ে করবে না। সত্যিই তপতী, ছেলেটা কোন দিন বিয়ে করবার একটা ইচ্ছের কথা ভুলেও বলেনি। কিন্তু আমার মনে হয়···

কি-যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন আর থেমে গেলেন মাধবী কাকিমা।

তপতী হাসে। —হাসলেন কেন কাকিমা ?

মাধবী কাকিমা আরও হাসেন—আমার সন্দেহ, কোন মেয়েকে আজ পর্যন্ত ভাল চোখে দেখেইনি বিহঙ্গ। এই প্রথম তোমাকে দেখলো আর··· ।

বিশ্বাস করে তপতী ; হ্যাঁ, তপতীকে দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে বিহঙ্গ। জীবনের এই প্রথম মুগ্ধ হওয়ার আনন্দকেই চিরকালের আনন্দ করে তুলতে চায় বিহঙ্গ।

উল্টোডাঙ্গায় এতবড় গ্লাস ওয়ার্কস, যেখানে দেড়শো মানুষ কাজ করে, সেটা বিহঙ্গভূষণেরই চেষ্টার কীর্ত্তি। রুড়কি থেকে পাশ করবার, আর টাটার লেবরেটরীতে পাঁচ বছর কাজ করবার পর খুব ভাল মাইনের একটা সরকারী চাকরি পেয়েছিল বিহঙ্গ। কিন্তু চাকরি পছন্দ করেনি বিহঙ্গ। সামান্য পুঁজি নিয়ে কারখানাটা চালু করেছিল। মজুর আর মিস্ত্রিদের সঙ্গে প্রায় একাকার হয়ে কাজ করত বিহঙ্গ। সেই বিহঙ্গের প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে। এখন বছরে এগার হাজার টাকা আয়কর দেয় বিহঙ্গ।

মাধবী কাকিমা কেন ডেকেছেন, সেটা অনুমান করতে কোন অসুবিধে নেই। বিয়ের দিনটাই ঠিক করতে চান মাধবী কাকিমা। তপতীও জানে, মাধবী কাকিমাকে কি বলতে হবে। আজ কালের মধ্যে নয়, এই তিনমাসের মধ্যেও নয়, বড়দিনের সময় কলেজটা যখন

বন্ধ থাকবে তখন যে-কোন একটা দিনে···হ্যাঁ, তার মানে হরেনকাকার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে যেন দিন ঠিক করেন মাধবী কাকিমা।

লঘু ভয়েলের শাড়ির গোলাপী আভা ফুরফুর করে। ঢিলে খোঁপার স্নিগ্ধ স্তবকও যেন একটা নিবিড় কুহকের ভারে টলমল করে। তপতীর সাজে আর প্রসাধনে বয়সভীরু কোন সঙ্কোচের ছায়াও নেই। তপতীর মূর্তিটা যেন ভালবেসে সুখী হবার একটা রঙীন আশা।

বিহঙ্গ ডাকে—চলুন; আর দেরি করে লাভ কি? না, আর দেরি করে লাভ নেই। বরং ক্ষতিই হতে পারে। তপতীর আশা আজ একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চায়। সেই নিশ্চিন্ততার পরম প্রতি-শ্রুতি যেখানে গিয়ে আজ পাওয়া যাবে, সেখানেই তপতীকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ডাক দিচ্ছে বিহঙ্গ। একহাতে পাইপ, আর অন্য হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে যে, ফুরফুর করে উড়ছে যার গলার সিল্কের নেকটাই, তার পাশে বসতে আজ আর একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না তপতী। যে-মানুষের জীবনের আশা ইচ্ছা আর আনন্দের গল্পগুলির সঙ্গে তপতীর জীবনের যত আশা ইচ্ছা আর আনন্দের সব গল্পগুলি একেবারে বর্ণে বর্ণে মিলে গিয়েছে, তার পাশে বসতে আর কুণ্ঠা বোধ করবারই বা দরকার কি?

তপতীকে দেখতে পেয়ে মাধবী কাকীমা প্রথমেই যে কথাটা প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেললেন, সে-কথা শোনবার পর তপতীর আর কোন কথা বলবারও রইল না।—আমাদের ইচ্ছা, বড়দিনের ছুটিতে তোমার কলেজ যখন বন্ধ থাকবে, তখন কোন একটি দিনে···হ্যাঁ, হরেনবাবুর সঙ্গে একবার একটা পরামর্শ অবশ্য করে নিতে হবে।

বিহঙ্গও মাধবী কাকিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারে

তপতী, যেন তপতীর রাজি হবার লজ্জিত হাসিটাকে দেখে মুগ্ধ হবার আশায় তপতীর মুখের দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে আছে বিহঙ্গ।

তপতী বলে—আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করুন কাকিমা।

মাধবী কাকিমা আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,—তোমরা তাহলে এখন ...হ্যাঁ এখানেই বসে একটু গল্প-সল্প কর; আমি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিই।

মাধবী কাকিমা চলে যাওয়া মাত্র বিহঙ্গ বলে—কিন্তু এখন আর তোমাকে আপনি-আপনি করে কথা বলতে পারবো না।

তপতী মাথা হেঁট করে—আপনার অভিরুচি।

বিহঙ্গ—আমার অভিরুচি, ওভাবে একটি খাঁটি বাঙালী মেয়ের মত মাথা হেঁট করে আর ঘাড় গুঁজে, লজ্জায় একেবারে মাটির পুতুলটি হয়ে গিয়ে কথা বললে চলবে না।

তপতী হাসে—খাঁটি বাঙালী মেয়ের কাছ থেকে বেশি অবাঙালী-পনা দাবি করা তো উচিত নয়।

বিহঙ্গ—না, আমি বাঙালীপনা একেবারেই পছন্দ করি না। ভারতীয়পনাও না।

—তার মানে?

—সত্যি কথা, এসব আমার ধাতে সহ্য হয় না। আমি পছন্দই করি না।

—একটু স্পষ্ট করে বলুন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ধর, তোমার এই শাড়ি; এভাবে ললিতলবঙ্গলতার মত দুলিয়ে ঝুলিয়ে না পরে, বেশ ফিটফাট গাউনের কিংবা স্কার্টের মতো ভঙ্গীতে তো পরতে পারা যায়।

—তা যাবে না কেন? চৌরঙ্গীতে বেড়াতে গেলেই তো দেখা যায়, কোন কোন শ্বেতাঙ্গী ওভাবে শাড়ি পরে চলেছে। কিন্তু সেটা কি দেখতে...।

—দেখতে খুব চমৎকার লাগে। সেটাই তো আমার চোখে একটা আইডিয়াল মেয়েলি স্টাইল।

—কিন্তু আমার তো দেখতে ভয় করে।

—ওসব ভয় করলে চলবে না, নিতান্ত বাজে ভয়।

—আমার তো মনে হয়, ভয়টা বাজে নয়, স্টাইলটাই বাজে।

—আশ্চর্য, তুমি যে ঠিক খাঁটি বাঙালী মেয়ের মত কুসংস্কারের কথা বলছো।

—বিলিতী কুসংস্কারের কথাই বা বলবো কেন ?

—বিলিতী কুসংস্কার ? তুমি শিক্ষিতা হয়েও কী অদ্ভুত কথা বলছো তপতী ?

—আপনি কি কখনো বিলেতে ছিলেন ?

—না; কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আমার মনে কোন ফল্‌স্ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ নেই। আমি জানি, আমাদের দেশী ধর্মকর্ম রুচিটুচি আর ধারণা-টারনা সবই বাজে। তা না হলে দেশটা এক হাজারেরও বেশী বছর ধরে পরের অধীন হবে কেন ?

—সবই বাজে নয়। ভাল-মন্দ দুই আছে।

—একটুও ভাল নেই। এদেশে আজ পর্যন্ত কোন ভদ্রলোক জন্মেছে বলতে পার ?

—কি বলেন ?

—একটা মানুষের মত মানুষ। অর্থাৎ একটা গ্রেট মানুষ কিংবা গ্রেট প্রতিভা ?

—কেন ? গৌতম বুদ্ধের মত…।

—ছিঃ, একটা পাগলকে নিয়ে ইতিহাসে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে যে…।

চমকে উঠে তপতী—আপনি যে সত্যিই দেখছি…।

বিহঙ্গ—কিছুই দেখনি তপতী। সেই জন্যেই বলছি। তুমি

তো এখন কাকিমার সঙ্গে বসে দিব্যি কইমাছের ঝোল আর লাউ-চিংড়ি আর যত লতাপাতার চচ্চড়ি খাবে। আমি ওসব অখাদ্য স্পর্শ করি না। আমার খাবার আসে মাদাম কষ্টেলোর কিচেন থেকে। প্রতি মাসে তিনশো টাকা আগাম জমা করে দিই। মাদাম কষ্টেলোর বয় দিনে দুবার খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। পাঁচ কোর্স লাঞ্চ আর আট কোর্স ডিনার ; হ্যাম কম্পালসরি।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে বিহঙ্গের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মাথা হেঁট করে তপতী। তাকাবার ভঙ্গীটাও অদ্ভুত ; যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে চোখ দুটো ; কিংবা চারদিকের আলো হঠাৎ সরে গিয়েছে, কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিহঙ্গ কিন্তু তেমনই তার জীবনের যত বিশ্বাসের আর ইচ্ছার আর অভিরুচির আনন্দটাকে আরও মুখর করে দিয়ে বলতে থাকে, —বিশু গাঙ্গুলী নামে আমার একটা কেরাণী ছিল। লোকটাকে আমি বেশ একটু পছন্দও করতাম। মাত্র একশো টাকা মাইনে পায়, তবু ট্রাউজার আর নেকটাই পরে, লোকটার রুচি দেখে ভালই লাগতো। কিন্তু একদিন ভুল ভাঙ্গলো, বুঝলাম লোকটা নিছক একটা খাঁটি বাঙালী কেরাণী। অফিসে বসে বিবেকানন্দের বই পড়ছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি লোকটাকে।

—কেন ? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা যেন এইবার কঠোর হয়ে চমকে ওঠে।

—না তাড়িয়ে উপায় কি ?

—অফিসে বসে অন্য বই পড়া একটা অন্যায় ঠিকই, কিন্তু আপনি কি সেইজন্যে ··।

—না না না ; লোকটা যদি অফিসে বসে উডহাউস পড়তো, তাহলে কি ওকে তাড়িয়ে দিতাম ? কখখনো না।

—কিন্তু আমি তো উডহাউস পড়তে ঘেন্না বোধ করি।

—কেন ?

—ঘেন্না লাগে বলে।

—বিবেকানন্দ পড়তে খুব ভাল লাগে না তো ?

—খুব ভাল না হোক, ভালই লাগে।

—এঃ; তোমার রুচি আর আমার রুচি···একেবারে যে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। কোন মিল নেই দেখছি।

—না, একটুও মিল নেই।

—যাক্, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে অবশ্য এটা কোন সমস্যা নয়।

—সমস্যা বৈকি।

বিহঙ্গ হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আমি যা বলতে চাই, তুমি সেটা বোধ হয় ঠিক ধরতে পারছো না তপতী। ত্বজনের মধ্যে ভালবাসা থাকলে এসব অমিল কোন সমস্যাই হতে পারে না।

কি ভয়ানক প্রবীণ বিজ্ঞের মত ভালবাসার রহস্য ব্যাখা করছেন ভদ্রলোক, যেন ভালবাসার কতই অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে। অথচ বয়স যে তপতীরই সমান ; একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে সে-কথাও মাধবী কাকীমা একদিন গল্প করে তপতীর কাছে বলেছিলেন। ভদ্রলোকের উপদেশ দেবার ভঙ্গীটা কত জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ কথাগুলি অজ্ঞানতার যত ছেলেমানুষী মুখরতা।

বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, ত্ব'জনের জীবনের অভিরুচির এত বড় একটা অমিল ত্বজনের মধ্যে কোন সমস্যা হয়ে উঠবে না। সমস্যা যে এখনই হয়ে উঠেছে, ভদ্রলোকের কাছে বসে থাকতে আর একটুও ইচ্ছে করে না। উঠে পড়তে পারলে বাঁচা যায়। গলার স্বর এত নামিয়ে আর নরম করে যে কথাটা বললেন ভদ্রলোক, সেটা যে নিছক একটা দেহতত্ত্বের চিৎকার। ভদ্রলোক যেন বলতে চাইছেন, মানুষের প্রাণ হলো একটা জন্তু, আর সেই জন্তুটারই

একটা দরকারের জন্য বিয়ে আর ভালবাসা। তাই তিনি কোন সমস্যার ভয় দেখতে পাচ্ছেন না।

কিন্তু তপতীর মনটা যে এরই মধ্যে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এতদিনের যত ধারণার কল্পনার আর আশার মনটা দুঃসহ লজ্জায় শিউরে উঠেছে। এমন বিয়ের কোন অর্থ হয় না। এত সাবধানে থেকে, এতদিন ধরে যে অপেক্ষার ধৈর্য স্বীকার করেছে তপতী, সেটা কি শেষ পর্যন্ত এরকম একটা ভুল বিয়ে করবার জন্য ?

বিহঙ্গ একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছ, তপতী।

না, আর দেরি করে না তপতী। যেন একটু পরিচ্ছন্ন বাতাস নিশ্বাসে পাওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মাধবী কাকিমা এসে আরও আশ্চর্য হলেন—কোথায় চললে তপতী ?

তবু আর দেরি করতে পারে না, এক কাপ চা খেতেও রাজি হয় না তপতী।

বিহঙ্গকে নয় ড্রাইভারকেই ডাক দিয়ে মাধবি কাকিমা বলেন—তপতীকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে এস সনাতন।

॥ ৪ ॥

হরেনকাকা কেন যে আর আসেন না সেটা কল্পনা করতে পারে তপতী। হিসেব করে বুঝতে পারে; কমদিন নয়, প্রায় একটা বছর পার হতে চললো, হরেনকাকা আর এদিকে আসেন নি, এই সড়কের উপর দিয়ে কোনদিন তাঁকে আর বেড়াতে যেতে দেখা যায় নি।

হরেনকাকার কিছু আর জানতেও বাকি নেই। বরং বেশ ভাল করে জানতে পেরেছেন বলেই একেবারে ক্ষমাহীন হয়ে দূরে সরে আছেন। তপতীর জীবনের ভাল-মন্দের জন্য তাঁর আর কোন আগ্রহ নেই।

মাধবী কাকিমাকে যে চিঠি লিখেছিল তপতী, সে চিঠির বক্তব্য হরেনকাকাকে জানিয়ে দিতে একটুও দেরী করেননি মাধবী কাকিমা।

—আমার বিয়ের কথা নিয়ে আপনারা আর চিন্তা করবেন না। দিনও ঠিক করবেন না। মাধবি কাকিমাকে অনিচ্ছার কথাটা জানিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি তপতী।

মাধবী কাকিমাও একটুও দেরি না করে বড় করুণ রকমের রাগের ভাষায় অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছিলেন—তোমার অদ্ভুত ব্যবহারের কথা হরেনবাবুকেও জানিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ভগবান জানেন, আমরা কি অপরাধ করলাম যার জন্যে তুমি আমাদের এত বড় একটা আশার সঙ্গে এমন অভদ্র ব্যবহার করলে।

হরেনকাকা নিশ্চয় আবারও ভুল বুঝলেন; মাধবী কাকিমার কথাগুলিকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করে তপতীকে একটা খামখেয়ালী অহংকারের মেয়ে বলে ধারণা করেছেন। তপতীর প্রাণটাকেই বোধহয় একটা উগ্র-শীতল অভদ্রতা বলে সন্দেহ করেছেন তিনি।

ভালবাসতে জানে না, বিয়ের নামে ভয় পায়; ভবতোষের মেয়েটা বোধহয় একটা উত্তাপহীন নিঃশ্বাস মাত্র; একটা রূপসী আয়না।

ভুল, ভয়ানক ভুল করেছেন হরেনকাকা, যদি এরকম কোন সন্দেহ তিনি করে থাকেন। তপতীর প্রাণটা যে এই বাড়ির নিভৃতে বসে আজকাল কেমন করে একটা অভিমানের কান্নার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, সে খবর জানেন না হরেনকাকা। কি ছাই একটা মন এসে জুটেছে তপতীর জীবনে। এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি গেঁয়ো চাষীর দশ বছর বয়সের একটা মেয়ের মন পাওয়া যেত। কিছুই ভাবতে হতো না, হেসে হেসে একগাদা মেটে সিঁদুর মাথায় ছড়িয়ে নিয়ে যে-কোন একটা লোকের বউ হয়ে যেতে পারা যেত।

কিংবা চোখ কান বুঁজে, কোন বাছবিচার না করে কাউকে ভালবেসে ফেলা যেত; তপতীরই ছাত্রী অনিন্দ্যা যে-রকম একটা ভালবাসার কাণ্ড করে বসে আছে। বিয়েও হয়ে গিয়েছে অনিন্দ্যার; এটর্ণির মেয়ে হয়ে পাশের বাড়ির টিউটর ছেলেটাকে বিয়ে করেছে।

কিন্তু হরেনকাকাও কি স্বীকার করবেন, খুব ভাল একটা কাণ্ড করেছে অনিন্দ্যা? কখনো না। হরেনকাকাও বলবেন, এসব কাণ্ডকে ভালবাসা বলে না। এগুলো অশিক্ষিত আর অসাবধান মনের একটা মূর্খতার ব্যাধি। মূর্খতাটা খুব দুঃসাহসী বলেই ব্যাধিটাকে একটা মস্ত সুখের এড্‌ভেঞ্চার বলে মনে হয়। শেষে অবশ্য ।

জানে তপতী, অনিন্দ্যার মনের অবস্থাটা শেষে কি দাঁড়িয়েছে। তপতীকেই চিঠি লিখেছে অনিন্দ্যা, ভুল করেছি তপতীদি; কিন্তু সে ভুল থেকে রেহাই পাবার কোন উপায়ও যে দেখছি না! শুনে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু সত্যি কথা, স্বামীকে আর একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু কোলের বাচ্চাটাকে বড় ভাল লাগে। যদি বাচ্চাটা না

থাকতো, তবে এমন একটি বিচিত্র চেহারা আর চরিত্রের স্বামীকে কবেই ছেড়ে দিয়ে, বাপের বাড়িতে যদি ঠাঁই পেতাম ভাল, নয়তো হাসপাতালের নার্স হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতাম।

না বুঝে-সুঝে ভালবেসে ফেলবার ভয়টাই যে তপতীর জীবনের ভয়। হরেনকাকা যদি এই সত্যটুক উপলব্ধি করতে পারতেন, তবে তপতীকে একটা বিয়ে-ভীরু অপদার্থ অহংকার বলে সন্দেহ করতে পারতেন না।

যে টলষ্টয়কে তপতীরই মত এত শ্রদ্ধা করেন হরেনকাকা, তিনিই বা কি করেছিলেন? জীবনের প্রথম ভালবাসাকে সত্যিই ভালবাসা বলে বিশ্বাস করে ফেলেননি টলষ্টয়! সে ভালবাসা সত্যিই ভালবাসা কিনা পরীক্ষা করে জানবার জন্যে সে-নারীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন টলষ্টয়। দু'জনের কেউ কারও চোখের কাছাকাছি ছিলেন না। এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, দুজনের মধ্যে চিঠি লিখে জানাজানির আগ্রহটুকুও ফুরিয়ে এসেছে। চিঠি লেখালেখিও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। টলষ্টয় বুঝেছিলেন, যেটা ভালবাসা বলে বোধ হয়েছিল, সেটা মোটেই ভালবাসা নয়, একটা অবুঝ উৎসাহের চঞ্চলতা।

হরেনকাকা আসেন না, কিন্তু তপতী তো একবার নিজে গিয়ে হরেনকাকাকে দেখে আসতে পারে। বুড়ো মানুষের শরীরটা কেমন আছে, এটুকু জানবারও কি কোন ইচ্ছে হয় না তপতীর?

অস্বীকার করে না তপতী, খুবই অভদ্রতা···অভদ্রতা কেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার ব্যাপার হচ্ছে; তপতীর মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে এখনো যে একটি মাত্র আন্তরিক প্রার্থনা বেঁচে আছে, তারই অপমান করতে হচ্ছে। কিন্তু হরেনকাকার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও যে একটা ভয় আছে। যখন তপতীর মুখের দিকে ভয়ানক উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকবে বুড়ো মানুষটির সেই স্নেহের চোখ দুটো, তখন

এমন কোন আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে কি তপতী, না কাকাবাবু, আপনি হতাশ হবেন না ?

আশ্বাস দিতে পারবে তপতী। কিন্তু আজ নয়। হরেনকাকাকে দেখতে যাবে তপতী, কিন্তু আজ নয়।

তবে কবে ?

আজ যদি নীরুদি আসেন, তবে আজই ; শুধু নীরুদির কাছ থেকে একটা কথা স্পষ্ট করে শোনবার অপেক্ষায় আছে তপতী। সে কথা শোনবার পরে আর একটুও দেরি করবে না, সোজা হরেনকাকার কাছে গিয়ে, হরেনকাকার দু'হাত চেপে ধরে, কিন্তু বেশ একটু রাগ করে বলে দিতে হবে, আপনি আমাকে মিথ্যে বারবার ভুল বুঝে মিথ্যে এত কষ্ট পেয়েছেন হরেনকাকা। কিন্তু ··? আর আমাকে ভুল বোঝবার সুযোগ পাবেন না। আমার বিয়ে। নীরুদি এসে আপনাকেও সব খবর জানিয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে নীরুদিরই অপেক্ষায় ড্রইংরুমের একটা কৌচের উপর বসে বই পড়ছিল তপতী। আশ্বিন মাসের একটা সকালবেলা। বাগানের ঘাসের উপর গাদা গাদা ঝরা শিউলি ছড়িয়ে আছে। কি আশ্চর্য, মৌমাছিগুলি এই ঝরা শিউলিগুলিকেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর গুনগুন করে যেন পিপাসার গান শুনিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

নীরুদি নয়, নীরুদির স্বামীর চাপরাশি এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। লিখেছেন নীরুদি—না, সুধাময় আসেনি, সুধাময়ের কাছ থেকে কোন চিঠিও আসেনি। কাজেই তোমাকে স্পষ্ট করে জানাবার মত কোন কথা এখন আর কিছু নেই।

নীরুদির বড় জায়ের ছেলে সুধাময়। নীরুদিই কিছুদিন আগে হঠাৎ এসে তপতীর মনে আচমকা একটা বিস্ময় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন —আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি এবার তোমার অহংকার ঘুচিয়ে দেব।

—অহংকার? বেচারী এক মাষ্টারণীর জীবনে কিসের অহংকার দেখলেন নীরুদি?

—বিয়ে করতে চাও না, বিয়েই করলে না; এই অহংকার।

—কে বললে বিয়ে করতে চাই না?

—তাহলে সমস্যাটা কি?

—সমস্যা হলো, কাকে বিয়ে করবো।

—কেন? আমাদের সুধাময়কে?

—সুধাময়ই বা আমাকে বিয়ে করবে কেন?

—ওর যে তোমারই মত দশা! বুঝতেই পারছে না কাকে বিয়ে করবে।

—ওঃ, এ যে চমৎকার মিল, মিলের ট্রাজেডি। তপতীর সাবধান প্রাণটা যেন একটা উদাস ঠাট্টার হাসি হেসে নীরুদির মুখের গল্পটাকে লঘু করে দিতে চেয়েছিল।

নীরুদি কিন্তু ভ্রুকুটি করেন—কেন, সুধাময়কে কি তোমার মনে পড়ে না?

—মনে পড়ে বইকি। আলাপও হয়েছিল। ভদ্রলোক কানপুরে না কোথায় যেন থাকেন?

—এখন আগ্রাতে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন আগ্রাতে নয়। ওদের অফিসটাই কলকাতাতে চলে আসছে।

—জার্মানীর সঙ্গে লেনদেনের কাজ করে, বোধহয় এইরকম কোন কোম্পানীর অফিস?

—হ্যাঁ, নানারকম মেশিনারীর একটা এজেন্সীর অফিস। সুধাময়ই হলো চীফ অর্গানাইজার।

—কিন্তু সুধাময় বাবু তো ল' পাশ করেছেন বলে শুনেছিলাম?

—ঠিকই শুনেছিলে। বেশ কিছুদিন ওকালতীও করেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল, এক জার্মান মক্কেলই সুধাময়কে একরকম জোর

করে কলকাতার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। ওকালতী করে তিনশো টাকাও হতো না। এখন কম করেও মাসে হাজার দুই হয়েই যায়।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় তপতী। আর নীরুদি যেন সেই নীরবতার উপর তাঁর প্রতিজ্ঞার জল্পনাকে আঁকতে থাকেন।—আমার খুব ইচ্ছে তপতী, সুধাময়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক্। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা সুখী হবে; বড়দি তোমার বিষয় সবই সুধাময়কে জানিয়েছেন। এখন আমার শুধু ভয়;···

—কিসের ভয় করছেন নীরুদি?

—তুমি আবার বেঁকে না বস। তা হলে আমাকে কিন্তু খুবই অপ্রস্তুত হতে হবে তপতী।

—না আপনাকে আর অপ্রস্তুত করতে চাই না।

—বেঁচে থাক লক্ষ্মী বোনটি। নীরুদি খুশি হয়ে একবার তপতীর গলা জড়িয়ে ধরে সেই যে চলে গিয়েছিলেন, তার পর থেকে যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আসতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু প্রায়ই চিঠি লিখতেন।—সুধাময় কলকাতায় আসছে। এলেই তুমি সব জানতে পারবে। আমি নিজেই গিয়ে সব কথা জানিয়ে আসবো। কিন্তু আর জানাবারই বা কি আছে? মোটকথা, তুমি আবার কোন রকম অপত্তি করে আমাকে বিপদে ফেলবে না।

তাই এখন শুধু প্রতীক্ষা। নীরুদি কবে এসে শেষ কথাটা বলবেন? তার মানে, সুধাময় কবে কলকাতায় এসে নীরুদিকে শেষ কথাটা বলবে।

সুধাময়কে সঙ্গে নিয়েও কি এখানে একবার আসবেন না নীরুদি? নিশ্চয় আসবেন। সুধাময়কে আর একবার দেখতেও পাবে তপতী। আবার আলাপ করবার একটা সুযোগও পাওয়া যাবে।

বিশ্বাস করতে ভালই লাগে, সুধাময়ের মত মানুষের ইচ্ছার আনন্দটাকে মাটি করে দেবার দুর্ভাগ্যে আর পড়তে হবে না।

নীরুদির মনে কোন সন্দেহ নেই, তাই বলে দিতে পেরেছেন, তোমরা দুজনে সুখী হবে। তপতীর মনে কোন সন্দেহ নেই, সুখী হতে পারা যায় বৈকি। নীরুদির কাছ থেকে সুধাময়ের নামে কত কথা শুনতে পেয়েছে তপতী, তার সবই যে ভাল কথা। এত জানবার পর আর কিছু জানবার কোন দরকারই হয় না।

কলেজে যাবার সময় হয়েছে।

হ্যাঁ, এখনও কিছুদিন শুধু বাড়ি থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে বাড়ি, তপতীর জীবনটাকে শুধু এই মাত্র একটা ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। যতদিন না সুধাময় কলকাতায় আসে ততদিন তপতীর জীবনে আর কোন ঘটনা নেই। তার আগে হরেনকাকার কাছে গিয়ে, হরেনকাকাকে সুখী করার মত কোন কথা বলবারও আর সময় নেই।

তপতীর ছাত্রীরাই বরং মাঝে মাঝে বেশ মিষ্টিরকমের ঘটনার আনন্দ উপহার দিয়ে তপতীর ক্লান্ত আশার হাসিটাকেও স্নিগ্ধ করে তোলে। হেন মাস আসে না, যে মাসে তপতীরই কোন না কোন ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যায়। ছাত্রীর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়; সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভালই লাগে তপতীর। মিষ্টি উৎসবের কাছে নিজেকেও মিষ্টি করে সাজিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে যায় না। কিন্তু প্রভার বিয়ে দেখতে গিয়ে প্রভার মার মুখের একটা কথা শুনে একটু আশ্চর্য হয়, একটু চমকেও ওঠে তপতী। প্রভার মা মিছি মিছি কেন এত আশ্চর্য হচ্ছেন?

—আপনাকে দেখে কিন্তু বুঝতেই পারিনি যে আপনি হলেন প্রভার তপতীদি। কি আশ্চর্য!

কিসের আশ্চর্য! ওভাবে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পরেই তপতীর রঙীন সাজের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন প্রভার মা?

ডোরা ডানকানের বিয়ে দেখতে গিয়ে আরও অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের আঘাত সহ্য করে বাড়িতে ফিরে আসতে হলো।

ডোরার মা এগিয়ে এসে তপতীর হাত ধরে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কে মাদাম ?

কোথা থেকে ডোরার বাবা ছুটে এসে ডোরার মা'র কৌতূহলের ভাষাটাকে শুধরে নেন।—মিস তপতী মল্লিক, ডোরার কলেজের সিনিয়ারমোস্ট টিচার।

দূরে একটা টেবিলের কাছের ছোট একটা গল্পমুখর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত ভাবে ডাক দেন ডোরার বাবা।—জর্জ।

তরুণ এক শেতাঙ্গের মূর্তি ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। ডোরার বাবা বলেন—এই দেখ জর্জ, তুমি যা দেখতে চেয়েছিল। ইনি হলেন ভারতীয় মহিলা ; দেখ, হাউ গ্রেসফুল !

—ইনডিড ! তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তোলে জর্জ।

তপতীর দিকে তাকিয়ে ডোরার বাবা বলেন—আমার বন্ধুর ছেলে জর্জ ক্রিস্টফার আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে। মাত্র একমাস হলো লণ্ডন থেকে এদেশে এসেছে জর্জ। শুনে খুশি হবেন আপনি, সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য জর্জ ইণ্ডিয়াতে এসেছে। জর্জ একজন স্কলার।

তপতীর হাত ধরে টান দেন ডোরার মা—চলুন ; ডোরাকে এক বার দেখবেন। ডোরা আপনার ব্লেসিং চায়।

শুধু ডোরাকে নয় ; মাঝে মাঝে আরও ছাত্রীর বিয়েতে ব্লেসিং জানাতে হয়েছে। দূরে চলে গিয়েছে যে-সব ছাত্রী, তাদেরও চিঠি আসে, অমুক তারিখে আমার বিয়ে, ব্লেসিং চাই তপতীদি।

ঘটনাগুলি যেন জানিয়ে দিয়েছে, তপতী এখন শুধু পরের বিয়েতে ব্লেসিং দেবার মানুষ, নিজে বিয়ে করে ব্লেসিং পাওয়ার

মানুষ নয়। কেন? তপতীর উপর পৃথিবীটার চোখে একরকম একটা শ্রদ্ধার আবেশ দেখা দিল কেন?

রোজই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ করবার সময়ই বা এই প্রশ্নটা বারবার তপতীর মনের মধ্যে একটা উৎপাতের মত আনাগোনা করে কেন? পাউডারের পাফ হাতের মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরে হঠাৎ কেন স্তব্ধ হয়ে যায় তপতী? নিজেরই চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন যেন সন্দেহ হয়; ওটা যেন তপতী মল্লিকের চোখের দৃষ্টি নয়, একটা করুণ আতঙ্কের দৃষ্টি।

দুর্বহ একটা ক্লান্তির দৃষ্টি বলেও যে মনে হয়। একটা আশার ভার আর অপেক্ষার উদ্বেগ সহ্য করে করে সত্যিই কি ক্লান্ত হয়ে এসেছে তপতীর বয়সটা?

নীরুদির শেষ চিঠিটা এসেছিল কবে? হিসেব করতে গিয়ে চমকে ওঠে তপতী। কম দিন তো হলো না। আরও যে প্রায় একটা বছর পার হতে চলেছে। আবার একটা শিউলি ঝরা আশ্বিন যে প্রায় এসে পড়েছে। সুধাময় তবে কি কলকাতায় আর আসেনি? হরেনকাকা কি আবার কার্সিয়ং এর হোমে চলে গিয়েছেন?

ও কি? আয়নাটা যে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতার আনন্দে ঝকঝক করে হাসছে। আয়নার বুকে তপতীর খোঁপার ছবিটার স্নিগ্ধ কালোর মধ্যে তিন চারটে সাদা সুতো কুঁকড়ে আছে কেন? সত্যিই কি সুতো?

রোজই হেয়ার টনিকে চুবিয়ে চুবিয়ে যে চুলের এত আদর করা হয়েছে, সেই চুলের উপর একটা সাদাটে ধিক্কারের চোরা বৃষ্টির ছিটে লেগে রয়েছে। জীর্ণতার জানান দিয়েছে তপতীর বয়সটা!

আর না বুঝতে পেরে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ডোরার মা মিস তপতী মল্লিককে কেন মাদাম বলে ডেকে ফেলেছিলেন। আর,

প্রভার মা কেনই বা তপতীর সাজসজ্জার ঝলমলে রঙীনতা দেখে এত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

বুকের ভিতরে যেন একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। তপতীর প্রাণটা যেন তপতীরই আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে এখনই শোকের কান্না কাঁদতে চাইছে।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছতে গিয়ে তপতীর হাতটা অলস হয়ে যায়। চোখের উপর রুমালটা চেপে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী।

কার পায়ের শব্দ? কে যেন ডাকছে বলে মনে হলো। ঘর থেকে বের হতেই বারান্দার উপর দেখা হয়ে যায়, নীরুদি এসেছেন।

নীরুদির মুখটা গম্ভীর। নীরুদির চেহারাটা যেন অপ্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তপতীর মুখটা তবু যেন জোর করে হাসে।—কি খবর নীরুদি?

—কোন খবর নেই তপতী।

যাক্, আর কোন কথা নীরুদিকে না জিজ্ঞাসা করলেও চলবে, তবু জানতে ইচ্ছে করে, কেন কোন খবর নেই।

নীরুদি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করেন।—সুধাময় কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু বিয়ে করতে রাজি নয় সুধাময়। স্পষ্ট বলে দিয়েছে।

বেশ করেছে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, কেন বিয়ে করতে রাজি হলো না সুধাময়।

নীরুদি বোধ হয় তপতীর মনের এই প্রশ্নটাকে আঁচ করতে পেরে, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যান,—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না তপতী।

তপতী হাসে—আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু আপনি তো উত্তরটা দিয়েই দিলেন।

—কি বললে তপতী ?

—আপনি না বললেও বুঝতে পেরেছি নীরুদি। আপনাদের সুধাময় বোধহয় আমার বয়সের হিসেবটা জানতে পেরেছে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সেজন্য আপনি কেন দুঃখ করছেন ?

—তুমি দুঃখিত না হলে আমিও দুঃখিত নই।

—আমি একটুও দুঃখিত নই নীরুদি।

—শুনে সুখী হলাম, আমি এখন আসি তপতী।

নীরুদি চলে গেলেন। আর, তপতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন হৃৎপিণ্ডের ভিতরের একটা বহ্নিজ্বালার দাউ দাউ শব্দ শুনতে থাকে। জীবনে এই প্রথম প্রত্যাখ্যান ; তপতী মল্লিকের কাছে আসতে এই প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে পৃথিবীর পুরুষ। কেন করেছে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েও গিয়েছে তপতী। একেবারে ভুলেই গিয়েছিল, বুঝতেই পারেনি, শিউলি ঝরানো রিক্ততার বাতাসটা কবে থেকে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তপতী মল্লিক এখন আর পৃথিবীর নয়ন-লোভা একটা রঙীন ফুল্লতা নয়।

আয়নার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়াতে ভয় হয়। আয়নাটা যে তপতীর জীবনের একটা জীর্ণতারই অভিশাপের ছবি দেখিয়ে দেবার জন্য নির্মম আনন্দে ঝিকঝিক করে হাসছে।

না, আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এমন শূন্যতা জীবনে কোনদিনও বোধ করেনি তপতী। সুন্দর সুস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরই যদি কেউ শুনতে পায়, তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তবে তার চোখের সামনে সব আলো যেমন শূন্য হয়ে যায়, এ যেন তেমনি একটা শূন্যতা।

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দু'পাশের

গাছের মাথায় পাখির ভিড় যেন বেড়েছে। পথের ভিড়ও বেশি। মানুষের পৃথিবী যেন বুঝতে পেরে খুশির উৎসবে মেতে উঠেছে, তপতী মল্লিকের জীবনটা আজ শেষ আশা হারিয়ে একেবারে একলা হয়ে গিয়েছে।

ফটকের দরজা ঠেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে সেই ভিখারীটা, অনেকদিন আগে যেটা একদিন এসে, একেবারে বারান্দার কাছে এসে বিশ্রী চিৎকার করে গান ধরেছিল। কম দিন তো নয়, সেই যে, একবছরেরও বেশি হবে, যেদিন হরেনকাকাও এখানে দাঁড়িয়ে তপতীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

ভিখারীটা কিন্তু কাছে এসেও গান ধরে না। তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা ভাষায় সোজা ভিক্ষার দাবি জানায়—দুটি ভিক্ষে দিন মা।

ভিক্ষার দাবি নয়, যেন একটা থান ইট ছুঁড়ে তপতীর কপালটাকে জখম করেছে, ভিখারীটা। ভিখারীটারও চোখে তপতী মল্লিকের বয়সের অভিশাপটা ধরা পড়ে গিয়েছে। এই ভিখারীটাই যে সেদিন অন্য ভাষায় ভিক্ষে চেয়েছিল—দুটি ভিক্ষে দিন দিদি।

ভিক্ষে পেয়ে কখন চলে গিয়েছে ভিখিরীটা, জানে না তপতী। কে ভিক্ষে দিল, দারোয়ান দীননাথ সত্যিই দীনের উপর দয়া করে দু'টো চাল ভিখিরীটাকে দিয়েছে কিনা, সে-খবরও রাখে না তপতী। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, ড্রয়িংরুমের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একটা স্মৃতি-হারানো স্তব্ধ অস্তিত্বের মত নিথর হয়ে বসে আছে তপতী। আর চোখের জলমোছার যে রুমালটা কোলের উপর পড়ে আছে, সেটা এখনও স্যাঁতসেঁতে, ঠোঁটটা এখনও নোনা।

কলেজ যাওয়া হয়নি। দুপুর পার হতে চলেছে। কলেজে যাবার উৎসাহ নেই, ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই বোধ হয়। কিন্তু

মনটা যেন মরিয়া হয়ে একটা শক্তি পেতে চাইছে, খুব জোর চেষ্টা করছে, ভাবনাগুলিকে ভুলিয়ে দেবার মত একটা শক্তি।

বারবার উঠে গিয়ে আর বই নিয়ে এসে এই চেয়ারের উপরে বসে আর পড়তেও থাকে তপতী। কিন্তু মন ভোলে না। বই-এর কথার মধ্যেও যেন আর কোন শক্তি নেই; তপতীকে বার বার আনমনা করে দিয়ে বইগুলোও যেন তপতীকে একলা করে দিয়ে সেই দুঃসহ শূন্যতারই মধ্যে ঠেলে দিতে চায়। ওয়ার অব রোজেজ—লাল গোলাপের যুদ্ধ··তপতীর প্রিয় ইতিহাসের প্রিয় কাহিনীর প্রিয়তাও যেন একটা নিরর্থক শূন্যতা; ওটা কলেজের এক মাষ্টারনীর জীবনের বেশ ভাল তৃপ্তি, খুব ভাল সার্থকতা। কিন্তু তপতী মল্লিকের জীবনে? কিছুই নয়; ভাবনা ভোলাবার মতও নয়।

হাতের কাছের ছোট ডেস্কটার দেরাজ টেনে একটা অ্যালবাম বের করে তপতী।

খানসামা পাঁচকড়ি এসে বার বার তিনবার ডাক দেয়। সাড়া দিতে ভুলে যায় তপতী। আরও কতক্ষণ পার হয়ে গেল, তা'ও বুঝতে ভুলে যায়; যেন বুঝতে আর ইচ্ছেও করে না। তা না হলে ঘড়ির দিকে আরও একবার তাকাতে পারতো তপতী।

কিন্তু এইবার, এতক্ষণ পরে, ভাবনা ভোলানো একটা স্বস্তির মধ্যে তপতীর মনটা যেন ডুবে গিয়েছে। চোখ দুটো হেসে হেসে চিকচিক করছে। খোলা অ্যালবামটার পাতার পর পাতা উল্টে কি এমন মধুরতার ছবি দেখছে তপতী, যার জন্যে তপতীর চোখ দুটোতে এরকম একটা পিপাসামধুর নিবিড়তা স্নিগ্ধ হয়ে ফুটে উঠতে পারে?

অ্যালবামে অনেক ছবি। বাবা আর মা'র ছবি।

অমলদা শ্যামলদা আর বিমলদার ছবি। গ্লাসগোর আনা বউদি, মিশিগানের লিজা বউদির ছবি। ছোট বউদি সরসীর ছবিও আছে।

গতবছর জাকর্তা থেকে যে ফটোটা এসেছে, সেটাও আছে।

হেসে ফেলে তপতী। কি কাণ্ড করেছে সরসী! কিন্তু কি চমৎকার দেখাচ্ছে। সরসীর এই নতুন সাজের চেহারা দেখে কার সাধ্যি বলতে পারে, এটা পটলডাঙ্গার একটি মেয়ের ছবি? এ সরসী যে একেবারে বিশুদ্ধ একটি জাভানীজ তরুণী।

অমলদার তিন ছেলে আর এক মেয়ের ছবি—সিরিল, আলফ্রেড, নোয়েল আর ক্লারা। শ্যামলদার এক ছেলে আর এক মেয়ের ছবি—জুলিয়ান আর আরাবেলা। বিমলদার এক ছেলে—সিরিমন্তো মহীধরো মল্লিক।

সিরিমন্তো অবশ্য বাংলাতেই একটা চিঠি লিখেছে; তুমি আর কলকাতাতে একলা থেক না পিসি; জাকার্তায় চলে এস। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

যাক্, সরসী জাভানীজ সাজ-টাজ যাই করুক না কেন, ছেলেটাকে তবু বাংলা শিখিয়েছে।

মিশিগান থেকে আরাবেলাও বছরে অন্তত একটি করে চিঠি দেয়। এই মেয়েটার কথা ভাবতে তপতীর মনটা মাঝে মাঝে বড় উতলা হয়ে ওঠে। মেয়েটা প্রত্যেক চিঠিতে চুমো পাঠায় আর চুমো চায়।

জুলিয়ানটাকে খুব দুরন্ত বলে মনে হয়। ইণ্ডিয়াতে বাঘ শিকার করতে আসবে জুলিয়ান, প্রত্যেক চিঠিতে এই সাধের কথাটা লিখতে ভোলে না। অনুরোধও করে, ডিয়ারেষ্ট আন্টি তপতী নিশ্চয় যেন কয়েকটা বাঘের ব্যবস্থা করে রাখে।

সত্যি, একেবারে একটা ফোটা ফুলের মত দেখতে বড়দার ছোট মেয়েটা—ক্লারা। ফটোটাকেই বুকে চেপে চটকাতে ইচ্ছে করে। আনা বৌদি এই ক্লারার একটা আবদারের কথা গত মাসের চিঠিতে লিখে জানিয়েছে—আরও এক ডজন কেষ্টনগর চাই। তার মানে

কেন্ট নগরের পুতুল, ছোট্ট ছোট্ট এক ডজন হাতি। সিরিল, আলফ্রেড ও নোয়েলের দাবি—আরও আমসত্ত। তিন ভাইয়ের জন্য ক্রিষ্টমাসের উপহার, এক পাউণ্ড আমসত্ত পাঠিয়েছিল তপতী। তার পরেই একটা ফটো এসেছে, তিন ভাই তিনটি আমসত্ত হাতে নিয়ে হাসছে। ইণ্ডিয়ার গ্রেট পূজা উপলক্ষে তপতীকে এই ফটোটাই উপহার পাঠিয়েছে গ্লাসগো থেকে তিন ভাই।

কে জানে কি মনে হলো, ক্লারার ফটোটাকে একেবার চোখের কাছে তুলে ধরে আদরের আবেগে সত্যিই কথা বলে ফেলে তপতী। দুষ্টু, ভয়ানক দুষ্টু, তোমাকে একবার কাছে পেলে হয়!

দরজার পর্দাটা হঠাৎ সরে যায়; আর একটা বিস্মিত কৌতূহলের মুখ উঁকি দেয়।

হরেনবাবু এসে ড্রইং-রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। পর্দাটা তিনিই সরিয়েছেন; আর, তাঁর হাতটাও যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পর্দাটাকে শক্ত করে খিমছে ধরে রয়েছে। ভবতোষের বাড়ির ভিতরে এ কেমন কাকলী শোনা গেল? কে কথা বলছে কার সঙ্গে? এ যে কোলের ছেলের সঙ্গে কারও প্রাণের একটা আদুরে মায়ার কাকলী।

কিন্তু না, কিছুই না, ভবতোষের এতবড় বাড়ির ভিতরে শুধু তপতী; তপতী নামে সেই শূন্যতার মূর্তিটাই একা বসে আছে। হরেনবাবুর উজ্জ্বল বিস্ময়ের চোখ দুটো আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

—আসুন কাকাবাবু। ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে আর এগিয়ে এসে হরেনবাবুর হাত ধরে তপতী।

হরেনবাবু বলেন—তুমি তো আমাকে দেখতে গেলে না, কাজেই আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে দেখতে এলাম।

তপতীর খুশির মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়। হরেনকাকার গলার স্বর বড় রুক্ষ, যেন বড় কঠোর একটা ভৎর্সনার শান্ত বজ্ররব।

ঘরের ভিতরে এসে চেয়ারের উপর বসেন হরেনবাবু।—বুঝেছি আমাকে আবার কার্সিয়ং-এর হোমেই চলে যেতে হবে। তাই এলাম; ভবতোষের খালি বাড়িটাকে শেষবারের মত দেখে নিয়ে চলে যাই।

—একথা কেন বলছেন কাকাবাবু?

—বলতে বাধ্য হলাম তপতী। তুমি আমার আশার কোন সম্মানই আর রাখতে পারলে না। কাজেই…।

তপতীর চোখ দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে। নিশ্বাসের মৃদু শব্দটাও ভীরু হয়ে যেন বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে চায়। হরেনকাকার অভিযোগের কাছে দাঁড়িয়ে আর মাথা তুলে কথা বলবার শক্তিটাই চরম ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছে।

—কি? কথা বলছো না কেন তপতী? চুপ করে রইলে কেন?

—মাপ করবেন কাকাবাবু; কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—নীরু লিখেছিল, সুধাময়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে। কিন্তু কই আজ পর্যন্ত তো আর কিছুই শুনলাম না।

—আপনার শোনবার মত কিছুই ছিল না। তাই বোধহয় নীরুদি আপনাকে আর কিছু জানায়নি।

—তার মানে আমার শেষ আশাটাও ব্যর্থ হলো।

তপতী আবার নীরব হয়ে যায়। ভবতোষের বাড়ির দুঃসহ শূন্যতার বেদনাটা যেন এইবার হরেনবাবুর গলার স্বরে ক্ষুব্ধ ধিক্কারের মত গম্ভীর হয়ে বেজে ওঠে। —তার মানে, আমাকে আশা দেবার মত কোন কথা তোমার নেই।

মুমূর্ষু মৌমাছির গুঞ্জনের মত ক্লান্ত-করুণ স্বরে তপতী বলে —আমিই যে আর আশা করতে পারছি না কাকাবাবু।

—বেশ ; আমি তাহলে উঠি। লেট গড ব্লেস ইউ।

চলে যেতে যেতেই একবার থমকে দাঁড়ান হরেনবাবু। অ্যালবামটা চেয়ারের উপর থেকে হাতে তুলে নিয়ে চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন।

তপতী এগিয়ে আসে। হরেনবাবু পাশে দাঁড়িয়ে মুখটাকে জোর করে হাসিয়ে নিয়ে, আর, যেন হরেনকাকার কঠোর ভাবনার কষ্টটাকে ভুলিয়ে দেবার একটা কৌশলকে কাছে পেয়ে তপতী ব্যাকুল হয়ে বলে—ফটোগুলি আপনি কোনদিন দেখেননি কাকাবাবু।

—কিসের ফটো ?

—এই দেখুন।

—কে এটা ?

—ছোড়দার ছেলে সিরিমস্তো মহীধরো মল্লিক।

—বিচিত্র ছেলে। হরেনবাবুর চশমার কাঁচটা যেন অপ্রসন্ন হয়ে যায়।

—এই দেখুন।

—কে এরা ?

—সিরিল আলফ্রেড নোয়েল আর ক্লারা। বড়দার তিন ছেলে আর এক মেয়ে।

—সাহেব আর মেমের ছেলে-মেয়ে বল। ভবতোষের নাতি-নাতনিরা এরকম হয় না। হরেনবাবুর চোখের দৃষ্টিটা রিক্ত হয়ে আর একেবারে রুক্ষ হয়ে কাঁদতে থাকে।

—এই দেখুন ; মেজদার ছেলে আর মেয়ে, জুলিয়ান আর আরাবেলা।

হাত তুলে অ্যালবামটাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেন হরেনবাবু—এসব দেখিয়ে আমার ঘৃণা আর বাড়িয়ে তুলো না তপতী।

সরে গিয়ে অ্যালবামটা হাতে নিয়ে কুণ্ঠিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। হরেনবাবু বলেন—এসব হলো ভবতোষের আশার শত্রু যত লিটল্ ফ্লাওয়ার্স; ওদের আমি চিনি। খুব ভাল করে চিনি।

যেন ভবতোষের কুলনাশা একটা অভিশাপের বিরুদ্ধে ভ্রুকুটি করে, একটা দুঃসহ ঘৃণা লজ্জা আর ভয়ের সান্নিধ্য থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার জন্যই তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেলেন হরেনবাবু।

॥ ৫ ॥

কার্সিয়ং-এর হোমের লনের কিনারায় একটা কাশ্মীরী চেনার। বেশ কিছুদিন আগেই গাছটার মাথা নতুন পাতায় ভরে উঠেছে। পাতাগুলি যেন তাজা সবুজের একটা উৎসবের যত দৃপ্ত পতাকা। সেই তাজা সবুজই ধীরে ধীরে ফিকে হতে হতে আবার যেন কেমন করে নতুন রক্তের মত টকটকে লাল হয়ে গেল। হাওয়া লেগে পাতাগুলি কাঁপে যখন, তখন তাকিয়ে দেখলে চোখেরও ভুল হয়ে যায়; পাতাগুলি যেন আগুন-লাগা জ্বালার রং মেখে হাসছে।

বুঝতে পারেন হরেনবাবু; অনেকগুলি মাস পর হয়ে গিয়েছে। চেনারের পাতার তাজা সবুজ লাল হয়ে যেতেই তো চার মাস সময় লাগলো। তার আগে একেবারে নেড়া ছিল চেনারটা। তারও প্রায় ছ'মাস আগে তিনি এসেছেন। কাজেই একটা বছর যে পার হয়ে গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

দূরের বরফের গায়ে সন্ধ্যার ম্লান আভা লুটিয়ে থাকে, লনের কিনারায় পায়চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতেও হঠাৎ এক একবার থমকে যান হরেনবাবু। বরফের বুকে সেই ঝিকিমিকি সোনালী উৎসব আর নেই। শেষ হয়েছে উৎসব। এখন শুধু ক্লান্ত আবীরের কান্নাটাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। তাই দূরের বরফকে এরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন হরেনবাবু। মনে হয়, ঐ দূরের বরফ আর হরেনবাবুর এই প্রাণ, মাঝখানে সত্যিই আর কোন দূরত্ব নেই। এই প্রাণের বয়সটা এখন নিতান্তই ধৃষ্টতা। এই হোমের আরামের মধ্যে আর পড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, চোখ বন্ধ করলে যে সত্যিই সোনালী উৎসবের দিনের মত দিনগুলির ছবি মনে পড়ে যায়। ভবতোষের বিয়ে; লজ্জা পেয়ে ভবতোষের মুখের দিকে তাকাতে না পেরে মাথা হেঁট করে হাসছে জয়া, খোঁপার সঙ্গে গাঁথা একগাদা ধবধবে যূঁইও কেঁপে কেঁপে হাসছে। ঐ তো, ভবতোষই ব্যস্তভাবে আসছে; সত্যিই কি পূর্ণিমার ফটোটা নিয়ে এল ভবতোষ? তবে তো আর রেহাই নেই; বিয়েটা করতেই হয়। কিন্তু···তুমি যে তোমার ফটোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর পূর্ণিমা!

ভুরু কুঁচকে চোখ ছুটোকে যেন নিংড়ে নিয়ে আবার পায়চারি করেন হরেনবাবু।

মাঝে একদিন নিঃশ্বাস নিতে অদ্ভুতরকমের একটা কষ্ট পেয়েছিলেন হরেনবাবু। ডাক্তার বললেন—নিশ্চয়ই আবার এমন কোন পুরনো কথা মনে করেছেন, যেটা মনে করতে আপনার খুব খারাপ লাগে।

—হ্যাঁ একটা পুরনো কথাই বটে।

কে জানে কেন ভবতোষের বাড়িটারই কথা মনে পড়েছিল। ভবতোষ আর জয়ার ব্যর্থ স্বপ্নের একটা প্রকাণ্ড কবরমহলের মত যে বাড়িটা এখনও সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে! ইচ্ছে হয়, এখনই তপতীকে একটা চিঠি লিখে অনুরোধ করতে, বাড়িটাকে তুমিও গিফ্‌ট্ করে দাও তপতী। তুমি কোন হোস্টেলে গিয়ে ঠাঁই নাও। আর বাড়িটাকে গবর্ণমেণ্ট যেন শিশুদের একটা হোম করে ফেলেন।

শেষ পর্যন্ত এরকম কোন অনুরোধের চিঠি তপতীকে অবশ্য লিখতে পারেননি হরেনবাবু। শুধু এরকম চিঠি কেন, কোন রকমই চিঠি লিখতে পারেন নি।

আর, আর-একদিন ভাবতে গিয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, এই প্রায় ছু'বছরের মধ্যে তপতীর কাছ থেকে একটাও চিঠি এল

না। তপতী মেয়েটা কি সত্যিই একটা পাথর? ওর মনে স্মৃতি বলে কোন জিনিস নেই? তা না হলে এমন ক'রে ভুলে থাকে কেন, এই হরেনকাকাই যে ওর বাবা ভবতোষের কাছে ওর মা জয়াকে এনে দিয়েছিল। এই হরেনকাকা যদি সেদিন রাগারাগি করে একটা কাণ্ড না বাধাতো, তবে ভবতোষ ভয় পেত না, বিয়ে করতে রাজিই হতো না, জয়ার সঙ্গে বিয়েই হতো না, আর জয়া আর যারই মা হোক, তোমার মা হতো না তপতী। তুমিই যে হতে না তপতী।

তুমি যে আজ তপতী হতে পেরেছ, এ সত্যটা যে এই হরেন কাকারই সেদিনের একটা রাগারাগি দাবির সৃষ্টি। কি আশ্চর্য, এহেন আপনজনের কাছে একটা চিঠি লেখবার আগ্রহও তোমার হয় না!

তপতীর কাছে চিঠি লেখবার কোন আগ্রহ হরেনবাবুও আর বোধ করেননি। এখন আগ্রহ বলতে শুধু একটি আগ্রহ; ভবতোষের বাড়িটার কথা যেন আর মনে না পড়ে। মনটাই যেন একটা ধূসর সন্ধ্যার ছায়ায় ভরে গিয়ে আবছা হয়ে যায়, সব স্মৃতি মুছে যায়।

কিন্তু জানেন না হরেনবাবু, সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর উপর এখন ধূসর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলেও ভবতোষের বাড়িটার ড্রইংরুমের ভিতরে আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর তপতীর মুখের হাসিটাও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যাটা যে ফাল্গুনের সন্ধ্যা, সে সত্য জানালা দিয়ে ঘরের বাইরের দিকে না তাকিয়ে, শুধু নিজের মনের দিকেই তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে তপতী। কিন্তু···নিঃশ্বাসের শব্দটা এরকম হয়ে গিয়েছে কেন? প্রাণটাকে এত একলা মনে হয় কেন?

যেন জোর করে, মনের ভিতরের ভয়-দেখানো প্রশ্নটাকে

দমিয়ে দেবার জন্য চিঠি লেখে তপতী। আমি ভাল আছি। পর পর চারটে চিঠি লিখে ফেলে তপতী। একটা পটলডাঙ্গাতে সরসীর বাবাকে, একটা গ্লাসগোতে বড়দাকে, একটা মিশিগানে মেজদাকে, আর একটা জাকার্তায় ছোড়দাকে।

নীরুদির গাড়িটা যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বাড়ির ফটকের উপর দাঁড়ায়।

—কেমন আছ তপতী। ঘরে ঢুকেই বেশ উৎসাহের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নীরুদি। তপতীর গম্ভীর মুখটা দেখতে পেয়েও একটুও গম্ভীর হলেন না।

তপতী হাসতে চেষ্টা করে—ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

—আমিও ভালই আছি। শুধু তোমার কথা মনে পড়লে ভাল থাকতে পারি না।

—কেন?

—তুমি বিয়ে করলে না।

—কেউ যখন বিয়ে করলোই না; তখন আর কি করে বিয়ে হবে বলুন?

তপতীর মুখের দিকে যেন দুটো গভীর কৌতূহলের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন নীরুদি। বোধহয় তপতীর মুখের এই কাতর হাসির অর্থ টাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন। এক অভিমানিনী কুমারী প্রৌঢ়ার আক্ষেপের হাসি।

এই রকমের একটি মুখ দেখবার আশা নিয়েই যে নীরুদি এসেছেন। জানতে চান, এখনও, এই পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটা নিয়ে বিয়ে করবার কোন ইচ্ছা আছে কিনা তপতীর।

নীরুদির চোখ দুটো যেন অদ্ভুত একটা সমবেদনার ভারে মায়াময় হয়ে ওঠে। তপতীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে তপতীর একটা

হাত ধরেন নীরুদি। তপতীর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকেন। তারপরেই তপতীকে একটা সোজা সহজ ও স্পষ্ট জিজ্ঞাসার আক্রমণ দিয়ে চেপে ধরেন—ঠাট্টা করো না, সত্যি করে বল তপতী ; আমার কাছে সত্যি কথা বলতে লজ্জা কিসের ?

—কি বলবো, বলুন ?

—বিয়ে করতে চাও ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে তপতী। কোন কথা বলে না। তপতীর প্রাণটাই যেন হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। কিংবা নিঃশ্বাসের একটা প্রচণ্ড লজ্জাময় জড়ত্ব ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জীবনের ইচ্ছাটাকে চিনতে চেষ্টা করছে। সত্যিই ইচ্ছাটা আছে কি নেই ?

তপতীর গম্ভীর মুখের উপর এক ঝলক লজ্জাভীরু রক্তের আভা যেন হঠাৎ উথলে ওঠে। মাথাটাও ঝুঁকে পড়তে চায়।

নীরুদি ডাকেন—বল, তপতী।

তপতী—ইচ্ছে তো হয়।

নীরুদি—শুনে সুখী হলাম ; বিশ্বাস কর তপতী।

এইবার নীরুদির মুখের হাসিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন নীরুদি। আর এই নিশ্চিন্ততারই আনন্দে গল্প করতে থাকেন। আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে গত মাসেই অনিমার একটা ছেলে হয়েছে। কী চমৎকার দেখতে বাচ্চাটা! দশ পাউণ্ড ওজন ; ক্লিনিকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন,—এখন এটাই হলো রেকর্ড ওজন। এর আগে যে বাচ্চাটার ওজন রেকর্ড করে ছিল, সেটা ছিল সাড়ে নয় পাউণ্ড।

তার পরেই অন্য একটা গল্প বলেন।—তুমি কি তোমার জামাই-বাবুর বন্ধু ধরণীবাবুর নাম কখনো শুনেছ ?

—না।

—ধরণীবাবু এখন কলকাতায় আছেন। বেশী দিন থাকবেন

না ; বড় জোড় একটি মাস। এখন পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সার্ভিসে আছেন। ইরিগেশনের ইঞ্জিনিয়ার। এরকম একটা ভদ্রলোক মানুষ আমি অন্তত কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, ড্রাইভার ধরণীবাবুর বিছানায় শুয়ে আছে, আর পাখা হাতে নিয়ে ড্রাইভারের মাথায় বাতাস দিচ্ছেন ধরণীবাবু।

তপতীর চোখ যেন একটা অদ্ভুত খুশির বিস্ময়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।—বাঃ, আজকাল এরকমও মানুষ পৃথিবীতে আছে তাহলে !

নীরুদি—ভদ্রলোক কিন্তু আজ পর্যন্ত বিয়ে করেননি।

তপতীর মাথাটা হঠাৎ আবার ঝুঁকে পড়ে।

নীরুদি বলেন—এখন কিন্তু বিয়ে করতে চান।

তপতী যেন গল্পটাকে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে। কোন কথা না বলে শুধু একটা হাত তুলে কপালটাকে আস্তে টিপে ধরে তপতী।

নীরুদি—ভদ্রলোক দেখতেও বেশ আর বয়স বোধহয় পঞ্চাশের বেশি হবে না। ধর পঞ্চাশ।

তপতীর কপাল-টেপা হাতটা হঠাৎ চমক লেগে শিউরে ওঠে। নীরুদির মুখের গল্প যেন হঠাৎ শিউরে উঠে তপতীর মৃদু নিঃশ্বাসের ছন্দটাকে একটা রূঢ় আঘাত দিয়েছে। মুখ তুলে আবার কোলের উপর রাখা বইটাকে একহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তপতী। আর, হঠাৎ মুখর হয়ে, যেন নীরুদির এই গল্পটাকে এখানেই স্তব্ধ করিয়ে দিতে চায়।—শুনেছিলাম অনিমার স্বামী নাকি এভারেষ্ট-যাত্রী একটা দলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা করছে।

নীরুদি—না সেটা আর হয়ে উঠলো কোথায় ? ইংরেজদের দল, ওরা কোন শিক্ষিত ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে নিতে রাজি নয়। সে যাই হোক্‌·· ···তুমি আমার সব কথা শুনলে তো।

—শুনেছি।

—এবার আমি তবে···।

—কি ?

—ধরণীবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা নিয়ে ··।

—ছিঃ।

—তার মানে ?

—আপনি ওসব কথা বাদ দিন নীরুদি।

—কেন ? ধরণীবাবুর বয়সটার কথা শুনেই কি তোমার ইচ্ছেটা মরে গেল ?

নীরব হয়ে হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে থাকে তপতী। নীরুদি গম্ভীর হয়ে বলেন—আশ্চর্য করলে তপতী। তুমিও তো বোধহয় পঁয়তাল্লিশ পার করে দিয়ে বসে আছ।

তপতীর মুখটা হঠাৎ যেন একটা করুণ লজ্জায় অভিভূত হয়ে আস্তে আস্তে বিড় বিড় করে।—আমাকে মাপ করবেন নীরুদি।

করুণ লজ্জা নয়, নীরুদি বোধহয় দেখলেন যে, একটা অকরুণ নির্লজ্জতাই তপতী মল্লিকের সুন্দর মুখটাকে কুৎসিত করে দিয়েছে। নীরুদির গলার স্বরটা একটু ক্ষুব্ধ আর ক্ষমাহীন হয়ে সত্যিই একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী ধ্বনিত করে ফেলে—তা হলে তোমার আর বিয়ে হবে না তপতী, হতে পারে না।

নীরুদি চলে যাবার পর ঘরের ভিতরে চুপ করে, আর, যেন বেশ একটু হতভম্বের মত একঠাই দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। ঠিক মাথার উপরেই পাখাটা খুব জোরে, যেন একটা চাপা আক্রোশের গুঞ্জনের মত শব্দ করে ঘুরছে। ফুরফুর করে উড়ছে তপতীর ভাঙ্গা-খোঁপার চুলের ছোট ছোট গুচ্ছ। কিন্তু কান দুটো যেন বড় বেশি তপ্ত হয়ে উঠেছে, পাখার বাতাসের ছোঁয়া কানের উপরে ফুরফুর করলেও সে-ছোঁয়া যেন অনুভব করতে পারা যাচ্ছে না।

যাক্, তবু বেশ স্পষ্ট করে আপত্তি করতে পেরেছে তপতী। নীরুদির মায়াময় অনুরোধের কাছে হঠাৎ দুর্বল হয়ে গিয়ে, তপতী তার এই সুন্দর চেহারার অনেক আশার স্বপ্নটাকে মিথ্যে করে দিতে রাজি হয়নি। প্রৌঢ় ধরণীবাবু তপতীর জীবনবাসরের দোসর হবে, প্রস্তাবটা যেন একটা ঠাট্টার বজ্রনাদের শব্দ, একটা শাস্তির আবদার, একটা প্রতিহিংসার আবেদন। তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাকে যেন একটা ভিখিরী মনে করে একটা সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছিল নীরুদির প্রস্তাবটা। অসম্ভব! নীরুদির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেন তপতী মল্লিকের আত্মাটাই প্রতিবাদ করেছে।

কিন্তু···বুঝতে পারে তপতী, তপতী মল্লিকের আত্মার এই জোরটাই যেন এইবার ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কাঁপছে তপতীর চোখের তারা দুটো। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যেন দুঃসহ একটা লজ্জা উথলে উঠছে। পাখার গুঞ্জনের মধ্যে যেন একটা ঠাট্টার চাপা গান গুনগুন করছে। ছিঃ, তপতী মল্লিকের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের স্বপ্নটা কোন্ লজ্জায় একটা অল্পবয়সের, নিজের চেয়েও কম বয়সের দোসরতা আশা করে? শুনতে পেলে এই ঘরের বাইরের সারা পৃথিবীর আলো-বাতাস যে হেসে ফেলবে। ভালবাসার মানুষ বাছতে গিয়ে তপতী মল্লিকের প্রাণটা কি এত-দিনে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে গিয়ে এমনই বেহায়া হয়ে গেল যে, নিজের চেয়ে কম বয়সের মানুষকেই জীবনের বান্ধব বলে মনে করবার আর মেনে নেবার একটা নতুন সাধের দাবি তপতীর স্নায়ুতে আর ধমনীতে গোপন উৎসের মত কল্লোল জাগিয়ে তুলেছে?

মনে পড়ে, নীরুদি একদিন সুধাময়ের কথাটা বলতে গিয়ে কত দুঃখিত হয়ে আর কাঁদ-কাঁদ চোখ তুলে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তপতীর বয়সের পরিচয় জানতে পেরে সুধাময় ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে; শুনতে পেয়ে তপতীর মুখে

একটা মৃদু হাসির বিস্ময় ফুটে উঠলেও বুকের ভিতরে যেন একটা ধিক্কার গর্জে উঠেছিল। সুধাময় নামে সেই ভদ্রলোক যেন ভদ্র-জগতের এক অদ্ভুত ক্যানিবালিজ্‌ম্‌-এর প্রতিনিধি; মনুষ্যত্বের বয়স খোঁজে না, শুধু মাংসলতার বয়স খোঁজে। ভালই হয়েছে, তপতী মল্লিককে বিয়ে করতে চায়নি সুধাময়। তপতীর জীবনটা যেন এক নরখাদকের নখরাঘাতের অভিশাপ থেকে বেঁচে গিয়েছে। সুধাময়কে সেদিন একটা ঘৃণ্য প্রাণী বলেই মনে হয়েছিল তপতীর।

কিন্তু আজ? আজ তপতী মল্লিকের প্রাণটা এ কী কাণ্ড করে বসে আছে! সন্ধ্যার আকাশ তো সূর্যোদয় দাবি করে না। কিন্তু তপতী মল্লিকের প্রাণের উপর অপরাহ্নের ছায়া ছড়িয়ে পড়লেও তপতীর আশা যেন নবারুণের ছোঁয়া দাবি করছে। সুধাময়ের আপত্তির মধ্যে যে অভিরুচির রূঢ়তা দেখে ঘৃণা বোধ করেছিল তপতী, আজ যে সেই অভিরুচি তপতীর বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। কত সহজে, একেবারে এককথায়, ধরণীবাবুর মত মানুষের ইচ্ছাকে সরিয়ে দিতে পেরেছে তপতী। ধরণীবাবু শুধু বয়সে প্রৌঢ়; এ ছাড়া আর কি কোন দোষ ধরতে পেরেছে তপতী? কিছুই না। অথচ বুঝতে অসুবিধা নেই, আর নীরুদিও বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের তপতী মল্লিকের পক্ষে ধরণীবাবুর বয়সটাকে দোষ বলে মনে করা কী অদ্ভুত পরিহাস! সাপের কামড়-খাওয়া মানুষ বিছার কামড়-খাওয়া মানুষকে ঠাট্টা করে, ঘৃণা করে, দুর্ভাগা বলে মনে করে! কি আশ্চর্য!

বুঝতে পারেনি তপতী, কখন দু'চোখ থেকে এত জল ঝরে পড়েছে! কোথায় লুকিয়ে ছিল এত কান্না? কেনই বা এত কাঁদাকাটা? কিসের জন্য?

কী লজ্জা! মনটা যেন বয়সের শাসন মানতে চায় না। কল্পনা করতে যেন তপতীর অন্তরাত্মাই ভয় পায়; তপতীর এই

মূর্তিটা এক প্রবীণ স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কি ভয়ানক কল্পনা! এমন জীবন যে জীবনই নয়; জীবনের শেষ অঙ্কের একটা ঘটনার ছবি মাত্র। একটা ক্লান্তিময় অবসর মাত্র।

ভিজে চোখ আবার কখন শুকিয়ে শান্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে; তাও বুঝতে পারেনি তপতী। শুধু বুঝতে পারে, আর নয়; আশার লজ্জাটাকে আজ এখনই স্তব্ধ করে দিতে হবে। তপতী মল্লিক আর কোন মুহূর্তের ভুলেও আশা করবে না। তপতীর এই একা-জীবন নিজের গৌরবে শান্ত আর সুখী হয়ে থাকুক। হরেনকাকাকে এখনই শেষ ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে, আর আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকাবাবু। আমি আর আশা করছি না। একা থাকতেই ভাল লাগছে; সারা জীবন একলা থাকতেই ভাল লাগবে।

চিঠি লেখা শেষ হয়নি, বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে কারা যেন কথা বলছে মনে হয়।

এসেছে আলিপুরের ছোট মাসি আর সুলেখা।

ছোট মাসির মাথাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর চোখে এক-জোড়া পুরু লেন্সের চশমাও পরেছেন ছোট মাসি।

ছোট মাসি বলেন—তিনটে বছর প্রায় অন্ধ হয়ে ছিলাম।

তপতী—তাই বলুন।

ছোট মাসি—তার মানে?

তপতী হাসে—তাই একদিনও একটু খোঁজও নিতে পারেননি যে, তপতী বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে।

ছোট মাসি—ঠিক কথা; কিন্তু তুমি তো অন্ধ হওনি। মাসিটা মলো কি গেল, সে-খবর তুমি তো একবার নিতে পারতে।

তপতী—নীরুদির কাছ থেকে আপনাদের সব খবরই পেয়েছি।

ছোট মাসি—আমিও নীরুর কাছ থেকে তোমার খবর পেয়েছি।

তপতী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে ওঠে। কারণ খিলখিল করে হেসে কথা বলেছে স্থলেখা—তপতীদি যে আমাকে এখনও দেখতেই পাননি বলে মনে হচ্ছে।

লজ্জিত হয় তপতী—দেখতে পেয়েছি বই কি!

স্থলেখা—না, পাননি। দেখতে পেলে এতক্ষণ ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতেন না।

তপতী তবু সেভাবেই শুধু স্থলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থলেখা এইবার মিটিমিটি হাসে; আর মাসিও হেসে ফেলেন।

তপতী—কি হলো? কি ব্যাপার? হাসবার কি হলো?

ছোটমাসি—স্থলেখা যে তোমাকে ঠাট্টা করে কথা শোনাচ্ছে, বুঝতে পারছো না?

তপতী—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

স্থলেখা এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। ছোটমাসি বলেন—তুমিই দেখছি অন্ধ হয়ে গেছ তপতী। আমার চোখের ছানি গিয়েছে, তোমার চোখে ছানি পড়েছে।

তপতী—কি বললেন?

ছোটমাসি—তা না হলে এতক্ষণেও কি দেখতে পেতে না, স্থলেখার কোলে ওটা কে?

সত্যিই তো, স্থলেখার কোলে একটা ফুটফুটে গাল-ফোলা ছ'মাসের বাচ্চা; মাথাটা যেন কালো রেশমের মত নরম চুলের স্তবক দিয়ে সাজানো।

—স্থলেখার বাচ্চা? হেসে চেঁচিয়ে ওঠে তপতী।

ছোটমাসি—হ্যাঁ।

স্থলেখার চোখের তারা দুটো যেন অদ্ভুত এক অহংকারের তারার মত ঝিকঝিক করে হাসতে থাকে।—যাক, চোখে আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলো, তবে দেখতে পেলেন। তা না হলে বোধহয় দেখতেই পেতেন না।

সুলেখার চোখের তারা দুটো হাসলেও মুখের ভাষাটা যেন ভয়ানক একটা ঠাট্টার চিমটি কেটে কথা বলছে। কিন্তু কেন? তপতীর আচরণে কী অপরাধ দেখতে পেয়েছে সুলেখা?

ছোটমাসি এবার যেন বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে, কিন্তু বেশ হেসে-হেসে সুলেখাকেই একটা ধমক দিয়ে সাবধান করে দেন—আঃ, বেচারা তপতীর অত কাছে এসে দাঁড়াসনি সুলেখা; বেবিটা শেষে একটা কাণ্ড করে তপতীর সিল্কের সাড়িটাকে ময়লা করে দিলে···।

সুলেখা হেসে ওঠে—ঠিক কথা। আমি তাহলে একটু সরেই দাঁড়াই।

ছোটমাসি এইবার সুলেখার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—অত ছটফট করিসনেরে শালা; মেম মাসির কোলে চড়বি, এমন আশা করিস না।

—এসব···কি-রকমের···যত বাজে কথা বলছেন ছোটমাসি! বিড়বিড় করে তপতী। কিন্তু তপতীর চোখে-মুখে যেন একটা দুঃসহ যন্ত্রণার জ্বালা ছমছম করতে থাকে। ছোটমাসি আর সুলেখার এইসব হাসিভরা ঠাট্টার ভাষা যেন কতগুলি ধিক্কারের প্রতিধ্বনি। তপতীর জীবনের ভুল ধরা পড়ে গিয়েছে; আর সেই ভুলের উপর যেন কতগুলি ঠাট্টার কশাঘাত আছড়ে পড়েছে।

না; দুঃসহ মনে হলে হবে কি? ছোটমাসি আর সুলেখার ভাষা যে কোন মিথ্যের চিৎকার নয়। সুলেখার কোলের ছেলেটাকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়নি তপতী; এ যে একেবারে বাস্তব সত্য।

হাত বাড়ায় তপতী—দাও সুলেখা; ওকে আমার কাছে দাও। কি নাম রেখেছ?

সুলেখা এবার যেন একটু খুশি হয়ে হাসে। বাচ্চাটাকে তপতীর হাতে তুলে দিয়ে বলে—এখনও কোন নাম হয়নি। যার যা ইচ্ছে সেই নামে ওকে সবাই ডাকে। ভুতো, ভম্বল, জ্যাকল, জমাদার, হাবা, হেরম্ব, অনিন্দ্য, ফেনুচু, বাবুই, হর্ষবর্ধন...।

কিছুক্ষণ ড্রইংরুমে, কিছুক্ষণ দোতলার ঘরে, তারপর কিছুক্ষণ ছাদের উপর; শেষে বাগানের চারদিকে ঘুরে-ফিরে গল্প করে তপতী, সুলেখা আর ছোটমাসি। এতক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও সুলেখার বাচ্চাটাকে কোলছাড়া করেনি তপতী। খানসামা পাঁচকড়ি যখন চা আনে, তখনও বাচ্চাটাকে দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখে গল্প করে তপতী।—জাকার্তা থেকে ছোট বউদির চিঠি এসেছে, বড়দা এখনও গ্লাসগোতেই আছেন...।

ছোটমাসি বলেন—আমি অবিশ্যি একটা উদ্দেশ্য নিয়েও এসেছি তপতী।

গম্ভীর হয় তপতী—বলুন।

ছোটমাসি—নীরুর সঙ্গে আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। হয়তো তুমিও শুনে থাকবে; আর আমাকে ভুল বুঝে থাকবে।

তপতী—আমি কিছুই শুনিনি।

ছোটমাসি—কথাটা এই যে, নীরু অনর্থক তোমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ইঞ্জিনিয়ার ধরণীবাবুর সঙ্গে...।

তপতী—সে-সব কথা শেষ হয়ে গেছে ছোটমাসি; আপনি জানেন কিনা জানি না।

ছোটমাসি—শেষ হয়ে গেছে মানে? বিয়ে ঠিক হয়েছে?

তপতী—না।

ছোটমাসি—কেন?

তপতী—অসম্ভব।

ছোটমাসি খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন—ঠিক বলেছ;

আমিও নীরুকে এই কথাটা কত করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি ; কিন্তু নীরু বুঝলো না যে, এ বয়সে কোন মেয়ের বিয়ে করে কোন লাভ নেই।

চমকে ওঠে তপতী। ছোটমাসি নিজের মনের খুশিতে বলতে থাকেন—এ বয়স পরের ছেলে কোলে নিয়ে সুখী হবার বয়স ; নিজের ছেলে তো কোলে আসতে পারে না। কাজেই…

তপতী—কি বললেন ?

ছোটমাসি—কাজেই এ বয়সে বিয়ে করবার কোন মানে হয় না।

সুলেখার বাচ্চাটা আর একটু হলে তপতীর কোল থেকে বোধহয় পড়েই যেত। ছোটমাসির কথাগুলি যেন তপতীর হাত দুটোকে ভয়ানক একটা হিংস্র অভিশাপের কথা দিয়ে আঘাত করেছে।

সুলেখার কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দরজার পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকে তপতী।

—এবার চলি তপতী। তুমি চেষ্টা করে যেও একদিন। বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ান ছোট-মাসি। সুলেখাও ব্যস্ত হয়ে বলে—চলি তপতীদি।

যেন তপতীর জীবনের হিসাব-নিকাশ করে শেষে একটা শূন্য পাওয়া গেল ; এই সত্যটাকেই চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে গেলেন ছোট-মাসি। তপতীকে যদি বলতেন ছোটমাসি, তুমি একটা বুড়ি মাধবী-লতা, তুমি একটা পাথরচাপা ঝর্ণা, তুমি একটা ছন্নছাড়া মেঘ ; তবু কথাগুলি একেবারে সব আশা তাড়িয়ে দেওয়া এক ভয়ানক নিয়তির গর্জনের মত শোনাতো না। কিছু আশা থাকতো। দেখেছে তপতী, বাগানের সাত বছরের একটা বুড়ি মাধবীলতা এবার ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। পাথরটা সরে গেলে চাপা ঝর্ণার জল

উথলে উঠবে। শুধু পাথরটাই দুর্ভাগ্য, কিন্তু ঝর্ণার বুকের ভিতরে প্রাণের কল্লোল তো জেগে আছে। সে জাগতে পারে, যদি দুর্ভাগ্যটা সরে যায়। ছন্নছাড়া মেঘ তবু তো মেঘ, সুযোগ পেলেই জল ঝরিয়ে মাটির পিপাসা মিটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ছোট মাসি যে-কথা বলে গেলেন, সেটা যে তপতী মল্লিকের এই মেয়েলী শরীরটার মৃত্যুর কথা। এখনও যে তপতীর এই উষ্ণ দেহটাকে জড়িয়ে যেন একটা সৌরভের আনন্দ খেলা করছে; ভুর-ভুর করছে সকালবেলার স্নানের সাবানের গন্ধ। কিন্তু ছোট-মাসি যেন এই সত্য মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন, ওটা একটা বেঁচে-থাকা শরীরের স্নান-করা তৃপ্তির সুগন্ধ নয়; ওটা একটা মমির গায়ের মসলার সুগন্ধ। তুমি একটা মিথ্যে অস্তিত্ব; সুলেখার কোলের ছেলেটার মত একটা ফুটফুটে প্রাণ সংসারকে উপহার দেবার মত শক্তি তোমার নেই তপতী। তুমি শুধু দেখতে মরুকুঞ্জ; কিন্তু আসলে ছলনা, মরুকুঞ্জের ছবি-মরীচিকা।

ছিঃ, কী বিশ্রী আক্ষেপ করছে, যত এলোমেলো কল্পনা আর ভাবনা। জীবনে কোনদিনও সন্দেহ করতে পারেনি তপতী, এরকম একটা আক্ষেপ তপতীর প্রাণের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। ইতিহাসের অধ্যাপিকা, এত শিক্ষিতা, আর, বস্তুত জ্ঞানিনী বলে ছাত্রীমহলে যে-নারীর এত সুনাম হয়েছে; সে-নারীর মনও এমন আক্ষেপ করতে পারে, শুনতে পেলে ছাত্রীরা যে আশ্চর্য হয়ে যাবে! নারীজাতির ইতিহাসকে পুরুষজাতির ইতিহাসের চেয়ে অনেক বড় গৌরবের ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করা যার অভ্যাস, সে আজ যেন হঠাৎ আদিমকালের রক্তমাংসের নারী হয়ে ভাবতে শুরু করেছে; নারীজাতির ইতিহাস বুঝি আঁতুড়ঘরের ইতিহাস। ছিঃ, চিন্তার এই দুর্বলতার কথাটা ভাবতেও লজ্জা করে।

বিকেল পার হতে চললো, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মনে হয়,

আর দেরি না করে এখনই একবার স্নান করে ফেলতে পারলে, মনের এই ঘিনঘিন ভাবটা কেটে যাবে ; শরীরটাও আর ঘিনঘিন করবে না। ছোটমাসির একটা বাজে কথাকে এত বেশি লাই দিয়ে ভাবতে গিয়ে যেন এই শরীরটাতেই ময়লা মাখিয়েছে তপতী।

হ্যাঁ, হরেনকাকাবাবুর কাছে লেখা চিঠিটাতে এবার আরও কয়েকটা কথা লিখে দিয়ে মুক্তি পেতে পারা যায়। আর দেরিও করে না তপতী। অনায়াসে, যেন প্রাণের এক নতুন অহংকারের আবেগে লিখে ফেলতে পারে ; না কাকাবাবু, আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এতদিন যখন একলা হয়ে থাকতে পেরেছি, তখন বাকি জীবনটাও একলা হয়ে থাকতে পারবো, থাকতে ভালই লাগবে।

চাকরটা চিঠি নিয়ে ডাকবাক্সে সঁপে দিয়ে আসবার জন্য যখন চলে যায় ; তখন আর মাত্র একটা মিনিট ড্রইংরুমের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। তার পরেই জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। আর, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যিই যেন জীবনের সব আশার ক্লান্তির ভার হাঁপ ছেড়ে সরিয়ে দিতে পেরেছে তপতী। বুঝতেও পারা যায়, প্রাণটা যেন অনেকদিনের একটা অপমানের চক্রান্তের গ্রাস থেকে মুক্তি পেল এতদিনে।

কিন্তু, এ কী হলো? তপতী মল্লিকের প্রাণের মুক্তি-পাওয়া আনন্দটাকে যে একেবারে বিস্বাদ করে দিল বাথরুমের মিরর। ঠাট্টা করছে, ধিক্কার দিচ্ছে মিররটা। নিটোল মেয়েলী শরীরের স্বাস্থ্য আর সুন্দরতার একটা প্রতিচ্ছবিকে বুকে ধরে মিররটা যেন মুখ টিপে হাসছে। বোধহয় বলতে চায়, দেখতে এত নিখুঁত আর সুন্দর মেয়েলী হলে হবে কি, ও-দেহ যে একটা সুন্দর অপদার্থ। সুলেখার চোখের তারায় যে গর্বকে আজ ঝিকঝিক

করে হাসতে দেখেছো, সে গর্ব তোমার চোখে কোনদিন ঝিকঝিক করে হেসে উঠতে পারবে না।

এতক্ষণ ধরে স্নান করা, এত ধোওয়া-মোছা শরীরটাকেও যেন আবর্জনার ভার বলে মনে হয়। বাথরুমের ভিতর থেকে যেন একটা যন্ত্রণাক্ত মূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে তপতী।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আর ইচ্ছা করে না। পাউডারের পাফ আর চিরুনি হাতে তুলে নিতে ভয় করে। বিছানার উপর অলস হয়ে বসে একটা বালিশকে কোলের উপর তুলে নেয় তপতী। আর বুঝতেও পারে; চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে বড় বড় কয়েকটা জলের ফোঁটা বালিশের উপর ঝরে পড়লো। এ কী ভয়ানক মৃত্যুর কথা বলে দিয়ে গেলেন আলিপুরের ছোটমাসি। সত্যিই কি তপতী মল্লিকের এই চেহারা নিছক একটা চেহারার পাথর মাত্র? স্নায়ু নেই? ধমনী নেই? রক্তধারা স্তব্ধ করে দেবার অভিশাপ কি সত্যিই এত কাছে এসে পড়েছে?

নীরুদি যেদিন বেশ রাগ করে আর তপতীর জীবনের ইচ্ছাটাকে একটা অসম্ভবের লোভ বলে ঘোষণা করে দিয়ে চলে গেলেন, সেদিন তপতীও কল্পনা করতে পারেনি যে, আর ক'দিন পরে, তপতীর জীবনের এত পুরণো আর এত ক্লান্ত ইচ্ছাটারই উপর একটা নতুন বসন্তের ফুল ফোটানো হাওয়া এমন করে ঝরে পড়বে।

মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌-এর সংস্কৃত ডিক্সনারির একটা ভল্যুম আর এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে-ছিল জর্জ। শেষ ক্লাসের পড়াবার পালা শেষ করে দিয়ে আর বাড়ি ফেরবার জন্যে একটু ব্যস্ত হয়ে হেঁটে কলেজের গেট পার হতেই চমকে উঠে তপতী। এ কি? এ যে চেনা মুখ! জর্জ

ক্রিস্টফার ; ডোরা ডানকানের বিয়ের দিনে যার সঙ্গে শুধু একটু বিনাকথার আলাপ হয়েছিল।

চেহারা দেখে মনে হয় না যে, ওটা সংস্কৃতভাষার একজন রীসার্চ স্কলারের চেহারা। যেন ছবি-আঁকা কিংবা গান-গাওয়া একটা কাঁচা শখের কাঁচা চেহারা। বয়সটাও যে তাই ; কলেজের থিয়েটারে রোমিও-জুলিয়েটের রোমিও সেজে ছিল যে ডোরা, বোধ-হয় তার চেয়েও কাঁচা রোমিও দেখাতো, যদি এই জর্জ ক্রিস্টফার রোমিও সাজতো। বয়সটা ত্রিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে।

সন্দেহ হয়, জর্জের সঙ্গে বোধহয় থার্ড-ইয়ারের মেরি কস্টেলো'র কোন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। বোধহয় মনের টানের কোন সম্পর্ক। কলেজের মধ্যে মেরি কস্টেলো মেয়েটাই দেখতে সব চেয়ে সুন্দর।

আরও একবার চমকে ওঠে তপতী ; জর্জের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময়। কথা বলেছে জর্জ, কী অদ্ভুত কথা!—আমি আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

বাংলাতেই কথা বলেছে জর্জ ক্রিস্টফার। কিন্তু সেদিন ডোরা ডানকানের বিয়ের দিনে প্রথম সাক্ষাতে ধারণাও করতে পারেনি যে, নমস্কার জানাবার ভঙ্গীটা জানলেও এই জর্জ বাংলা বলতেও জানে। কবে বাংলা শিখলো জর্জ ? কেমন করে শিখলো ? ও যে সবে মাত্র লণ্ডন ছেড়ে কলকাতায় এসেছে।

জর্জ বলে—সেদিন আপনার সঙ্গে আমার বেশি কথা বলবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বলতে পারিনি, আমি দেশে থাকতেই বাংলা শিখেছি। আর, শুনে আশ্চর্য হবেন, আপনার দাদা শ্রীবিমল মল্লিকের কাছেই আমি বাংলা শিখেছি। আমি যে গ্লাসগোতে দু'বছর ছিলাম।

—আপনি বিমলদাকে চেনেন ? তপতীর চোখ-মুখ উতলা করে দিয়ে একটা খুশির হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—সেই কথাই তো বলছি। বিমলদারই কাছে আপনার কথা শুনেছি। কলকাতায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য ক'দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার আগেই ডানকানদের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—কিন্তু আপনি তো সেদিন আমাকে কিছু বললেন না।

—আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলেই আর কোন কথা বলিনি, সেই জন্যেই আজ·· ···।

—এখানে এলেন কেন ?

—আপনার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি কলেজে আছেন। তাই······আপনি হয়তো বলতে পারেন······।

—কি ?

—আপনাকে এত ব্যস্ত হয়ে দেখতে আসবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু··· ··।

—কি বললেন ?

—কিন্তু মাপ করবেন, যদি একটা সত্য কথা সাহস করে বলে ফেলি।

তপতীর বিস্ময়টা এইবার যেন বুকের ভিতরে একটা আতঙ্কের দুরু-দুরু শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে বাজতে থাকে।

জর্জ বলে—আপনাকে দেখতে এত ভাল লেগেছিল যে, এই কটা দিন কোন মুহূর্তে আপনাকে ভুলে থাকতে পারিনি।

চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তপতী এক নিঃশ্বাসে কতগুলি কথা বলে দিয়ে এগিয়ে যায়।—আমি চলি ; বিমলদাকে নিশ্চয়ই লিখবো, আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

জর্জ বলে—কিন্তু, আমি কি এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না ?

—মিষ্টার ক্রিস্টফার। আপত্তি করবার অসৌজন্যের ভয়টাকে

কৌশলে চাপা দেবার জন্য একটা ভীরু হাসি কোনমতে হেসে নিয়ে কি যেন বলতে চায় তপতী। কিন্তু জর্জই বাধা দিয়ে বলে—প্লীজ, আমাকে মিস্টার ক্রিস্টফার বলে ডাকবেন না। আমি আপনার জর্জ।

কিছুক্ষণের মত যেন একটা মূর্চ্ছাময় ভীরুতার আবেশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। তপতী মল্লিকের আপত্তি করবার শক্তিটাই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আর, আপত্তি করতেও পারে না তপতী।

জর্জেরই পাশে পাশে হেঁটে ভবতোষ মল্লিকের এই বাড়িতে ঢুকে এই ড্রইং-রুমের ভিতরে দুটি কোচের উপর দু'জনে বসে। যেন দুটি ভয়ানক উতলা বিস্ময় বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দুটি শান্ত মুখ হেসে হেসে গল্প করতে থাকে।

গল্পগুলি এমন কোন কৌতুকের গল্প নয়; এদেশ আর ওদেশের জল-বাতাসের যত দোষ-গুণের গল্প। তবু, এহেন নিতান্ত যত তথ্যের কথাও যেন দু'জনের হাসির ছোঁয়ায় সুস্মিত হয়ে উঠে। এদেশের বৃষ্টি দেখতে জর্জের খুবই ভাল লাগে।

তপতী হাসে—এদেশের কাদা?

জর্জ—অসম্ভব। এদেশে এসে যা দেখে সব চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি, সেটা হলো কাদা।

তপতী—আপনাদের দেশে কাদা নেই?

—আছে বৈকি। কিন্তু এরকম ভয়ানক কাদা নয়।

তপতী বলে—আপনাদের দেশের শীতটা কিন্তু ভয়ানক।

জর্জ—আমি অবশ্য তাই মনে করি; যদিও অনেকে সেটা মনে করে না। আপনাদের দেশের শীত সত্যিই যেন একটা আশীর্বাদ। কিন্তু···।

তপতী—কি?

জর্জ—আপনাদের দেশের গ্রীষ্ম কিন্তু একটা অভিশাপ।

পাঁচকড়ি খানসামা যখন চা নিয়ে আসে, তখন এই স্মিত হাস্যবিজল্পিত আলাপ আলোচনার একটানা উল্লাসটা একটু আনমনা হবার সুযোগ পায়। জর্জ ক্রিস্টফার চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে; বোধহয় চায়ের পেয়ালার গায়ে আঁকা সাকুরাহানার কুঞ্জটার দিকে তাকিয়ে জাপানী আর্টের কথা ভাবতে শুরু করেছে জর্জ। কিন্তু তপতী মল্লিক যেন এতক্ষণে নিজের দিকে তাকাতে পেরেছে। চমকে ওঠে তপতীর চোখের দৃষ্টিটা। যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে তপতী মল্লিকের এতক্ষণের এই অদ্ভুত রকমের নির্লজ্জ অসতর্কতা। এ কি কাণ্ড করে বসে আছে তপতী। তপতীর প্রাণটা যেন হঠাৎ পাগল হয়ে নিজের বাগানের বেড়া ভেঙ্গে দিয়েছে। তা না হলে, জর্জ ক্রিস্টফারের মত একটা মানুষ আজ এবাড়িতে তপতীর এত কাছে বসে আর এত সুখী হয়ে চা খাওয়ার সুযোগ পাবে কেন?

জর্জ হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলে, তাই; তা না হলে তপতী বোধ হয় বুকের ভিতরের ভয়াতুর নিঃশ্বাসটার ভয়েই এখনি একটা দৌড় দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেত।

জর্জ বলে—আমি সংস্কৃত ভাষাকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সভ্য ভাষা বলে মনে করি। আজকের অনেক সভ্য ভাষা সংস্কৃতের কাছেই ঋণী। কিন্তু…।

তপতী—কি বললেন?

জর্জ—কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ভারত বিদেশের কাছে ঋণী।

তপতী—তার মানে?

জর্জ—ধরুন বৌদ্ধধর্ম। এটা গ্রীস থেকে ধার করা ধর্ম।

তপতী আশ্চর্য হয়—কী অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি!

জর্জ—ঠিক কথা বলছি। গ্রীক পাইথাগোরাসের চিন্তার কাছ থেকেই ধারণা সংগ্রহ করে ভারতীয়েরা বৌদ্ধ মতবাদ তৈরী করেছিল।

তপতী—কোন্ ইতিহাসে একথা লেখা আছে ?

জর্জ—তা জানি না; তবে আমাদের দেশের বিখ্যাত স্কলার রিচার্ডসন, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, এখন তিনি ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা···যিনি আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বলেছেন, একদিন একটা লোক একটা ব্যাংকে লাঠি দিয়ে মারছিল। আহত ব্যাং আর্তনাদ করছিল। পাইথাগোরাস সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকটাকে অনুরোধ করলেন, ব্যাংটাকে প্রহার করো না। কেন ? প্রশ্ন করেছিল লোকটা। পাইথাগোরাস বলেছিলেন, তুমি বুঝতে পারছো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার এক মৃত বন্ধুর গলার স্বর এই আহত ব্যাং-এর আর্তনাদের মধ্যে বাজছে।

তপতী—এতে কী প্রমাণিত হলো ?

জর্জ—রিচার্ডসন বলেন, পাইথাগোরাসের এই উক্তিই একটা থিওরী, ট্র্যান্সমাইগ্রেসন অব সোল, আত্মা এক জীবকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জীবের ভিতরে গিয়ে আশ্রিত হয়। বৌদ্ধরা পাইথাগোরাসের এই ভেক-কাহিনী থেকেই জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করেছে।

তপতী হাসে—আপনাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রিচার্ডসনকে ইতিহাস যেন ক্ষমা করে।

জর্জ—আপনি অস্বীকার করছেন ? বৌদ্ধধর্ম কি সত্যিই গ্রীস থেকে···।

তপতী—বেচারা বুদ্ধ পাইথাগোরাসের এই গল্পটি শুনলে হেসে ফেলতেন।

জর্জ—যাক্, বোঝা গেল আপনি রিচার্ডসনের অভিমত পছন্দ করেন না।

তপতী—পছন্দ করা বা না-করার প্রশ্ন নয়।

জর্জ—তবে ?

তপতী—আমার বিশ্বাস, রিচার্ডসন হয় পাগল, নয় ভারতবিদ্বেষী।

জর্জ হেসে ওঠে—বিশ্বাসের দেবতা আপনাকে ক্ষমা করুন।

তপতী—অকারণে ঠাট্টা করছেন।

জর্জ—না, ভারতীয়দের চিন্তার সঙ্কীর্ণতা দেখে আমি খুব কষ্ট পাই। তারা একটা কুসংস্কারের জন্য প্রাণ দিতেও পারে; পাণ্ডিত্য আর বিজ্ঞানকে কিছুতেই বিশ্বাস না করাই যেন ভারতীয় মনের ধর্ম।

তপতী—শুনেছি, আপনাদের দেশের রাজ সিংহাসনের সঙ্গে মস্ত বড় একটা পাথর আছে, যার নাম ভাগ্যের পাথর; স্টোন অব ডেস্টিনি।

জর্জ—হ্যাঁ। বড় সুন্দর একটা ঐতিহাসিক পাথর।

তপতী—ঐতিহাসিক তো বটে; কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞান কি বলে? পাণ্ডিত্যই বা কি বলে? সত্যিই কি ওটা ভাগ্যের পাথর?

জর্জ—তা জানি না। তবে আমাদের বৈজ্ঞানিক আর পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিছু বলবার দরকার আছে বলে মনে করেন না।

তপতী—তার মানে তাঁরা একটা কুসংস্কারকেই ভালবাসেন?

জর্জ চোখ বড় করে তাকায়—কুসংস্কার?

তপতী—হ্যাঁ মিস্টার ক্রিস্টফার। ওটা যে একটা কুসংস্কারের পাথর।

জর্জ—বুঝলাম, আপনি বিদেশবাসীর একটা রোমান্টিক ধারণাকেও কুসংস্কার বলে মনে করেন।

তপতী—রোমান্টিক কুসংস্কারকেই কুসংস্কার বলে মনে করি; রোমান্টিক ধারণাকে নয়।

জর্জ—আপনি তর্ক করতে খুব পটু।

তপতী—আপনি যুক্তি স্বীকার না করতে খুব পটু।

জর্জ—এরই মধ্যে আপনি আমার এত বড় একটা অপরাধ আবিষ্কার করে ফেললেন?

বড় বেশি বিমর্ষ হয়ে, আর কেমন যেন করুণ হয়ে গিয়ে, মৃদুস্বরে কথা বলে জর্জ।

তপতী হঠাৎ অপ্রস্তুতের মত, আর, যেন একটু লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়—আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার কোন অপরাধ আবিষ্কার করবার জন্য আমার কোন সাধ নেই। আমি শুধু তর্কের জন্য তর্ক করেছি।

জর্জের মুখটা যেন তপতীর এই সামান্য সান্ত্বনাতেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে।—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এদেশকে ঘৃণা করবার জন্যে এদেশে আসিনি। অনেক আশা নিয়ে এসেছি। ইচ্ছে আছে, অন্তত একটা বছর সংস্কৃত ভাষা নিয়ে রিসার্চ করবো।

তপতী—তারপর ?

জর্জ—তারপর দেশে ফিরে যাব।

তপতী কি-যেন বলতে চেষ্টা করে। জর্জ তার আগেই ব্যস্ত-ভাবে উঠে দাঁড়ায়, জানালার বাইরে সাদা ফুলে ভরা যে গাছটাকে দেখা যায়, সেটারই দিকে যেন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে জর্জ।

তপতী—কি দেখছেন ?

জর্জ—এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি।

তপতী—কি ?

জর্জ—এতক্ষণ ধরে বাতাসে যে সুগন্ধ অনুভব করছিলাম, সেটা ঐ ফুলেরই গন্ধ বোধহয়।

তপতী—হ্যাঁ।

জর্জ—তাই বলুন। আমি মনে করেছিলাম, আপনারই চুলের গন্ধ।

চমকে ওঠে তপতী। জর্জ যেন নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে।—এখন বুঝতে পারছি, বাজে প্যারিসিয়ান হেয়ার অয়েলের গন্ধটা এতক্ষণ ধরে আপনার খোঁপা থেকেই আসছিল।

তপতী মল্লিকের মুখের দিকে আরও অদ্ভুত রকমের স্নিগ্ধ দৃষ্টি

তুলে তাকিয়ে থেকে জর্জ বলে—যাই বলুন, ঐ সাদা ফুলের সুগন্ধটা যদি আপনার খোঁপাতেও থাকতো, তবে আপনাকে আরও কত সুন্দর বলে মনে হতো।

তপতী মল্লিকের হৃৎপিণ্ডটাই বোধহয় ভয়ে আর লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে যায়। জর্জ তেমনই মুখর হয়ে বলতে থাকে।—ভারতীয় ফুলের চেয়ে মিষ্টি গন্ধ কোন দেশের ফুলে নেই। এটা আমি জোর করে বলতে পারি। আপনি কেন মিছিমিছি বিদেশের ফুলেল গন্ধের তেল মাথায় মাখেন ?···আচ্ছা চলি।

বারান্দার সিঁড়ির মাত্র তিনটে ধাপ জর্জের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে পার হয়ে তপতী মল্লিকের মূর্তিটাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তপতীর অন্তরাত্মা বোধহয় এই স্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে ওঠে। চলে যাচ্ছে জর্জ। চেঁচিয়ে ডাক দেয় তপতী।—আবার কবে আসছো জর্জ ?

থমকে দাঁড়ায় জর্জ। পিছু ফিরে তাকায়।—আসতে বলছেন ?

তপতী—নিশ্চয়।

জর্জ বলে—তাহলে কালই আসবো।

চলে গেল জর্জ। আর তপতীও যেন একটা বিস্ময়ের সৌরভে অভিভূত সত্তার মত আস্তে আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরের দিকে চলে যায়। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই দেখতে পায়, কি-ভয়ানক লালচে হয়ে গিয়েছে তপতী মল্লিকের মুখটা। সত্যিই যে, প্যারিসিয়ান হেয়ার অয়েলের গন্ধটা একটুও ভাল লাগছে না। কিন্তু···ভগবান জানেন, কামিনী ফুলের গন্ধ মেশানো হেয়ার অয়েল ভূ-ভারতে কোথায় পাওয়া যায়।

কালই আবার আসবে জর্জ। ছি-ছি, এ কি হলো! জর্জের অঙ্গীকার যেন তপতী মল্লিকের অদৃষ্টের চারদিকে একটা আশার অঙ্গীকার হয়ে গানের সুরে গুনগুন করছে। এত তর্ক হলো,

কথায় কথায় কত অমিল ধরা পড়ে গেল, তবু যে জর্জকে ভাবতে ভাল লাগছে।

আর এমন কোন একটি দিনও বাদ যায়নি, যেদিন জর্জ এই বাড়িতে না এসেছে। না, আজ আর তপতী মল্লিকের জীবনের যত ভীরুতার, লজ্জার আর সাবধানতার স্মৃতিটুকুও নেই। সবই ভুলে গিয়েছে তপতী, ভাগ্যটাই যে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। দু'জনের মধ্যে যে অমিল, সেটা যে দুটো মহাদেশের অমিল, তাও বুঝতে ভুলে গিয়েছে তপতী। দু'জনের বয়স দুটো যে কত বড় অমিল, সেটাতো মনেই পড়ে না। বরং তপতীর চোখের তৃপ্তি-বিহ্বল দৃষ্টিটা চোখে পড়লে মনে হবে, তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়স এই অমিলেরই জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। জর্জের ভালবাসা যেন তপতীর বয়স্ক লজ্জাটাকেই একটা গর্ব করে তুলেছে। কত মিথ্যে হয়ে গেল নীরুদির ভবিষ্যদ্‌বাণী।

কথায় কথায় তর্ক উঠেছিল একদিন। তর্কটা বড় বেশি তপ্তও হয়ে উঠেছিল। তপতীর মুখের ভাষাও সেদিন যেন সব সংযম হারিয়ে একেবারে বিদ্রোহের আর ধিক্কারের ভাষা হয়ে বেজে উঠেছিল। জর্জও একটুও বিচলিত না হয়ে, তপতীকে কটুভাষার আঘাতে জর্জরিত করেছিল। কি-ভয়ানক অহংকারের ভঙ্গীতে কথা বলেছিল জর্জ।—তুমি ইতিহাসের অধ্যাপিকা হতে পার ; কিন্তু ইতিহাসের কিছুই বোঝ না।

তপতীর চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।—কি বললে ?

জর্জ—তুমি অকারণ একটা পলাশীর যুদ্ধ বাধিয়ে আমাদের ভালবাসার শান্তি নষ্ট করতে চাইছো।

তপতী—তবে স্বীকার কর ; তুমি একটি ক্লাইভ দি অ্যাডভেঞ্চারার, শুধু লুঠপাট করবার জন্যে এদেশে এসেছো।

জর্জ—মিথ্যে কথা।

তপতী—খুব সত্যি কথা, তা না হলে তুমি একেবারে নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে কস্টেলোদের বাড়িতে যাও কেন?

জর্জ—মিস্টার কস্টেলো জানেন, কেন যাই।

তপতী—মেরি কস্টেলোও জানে, কেন তুমি ওদের বাড়িতে যাও।

জর্জ—জানে। মিস্টার কস্টেলো আমাকে হিব্রু ভাষা শিখতে সাহায্য করেন; একথা সে-ও জানে।

তপতী—তুমি যে মেরির সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে ভালবাস, সেটাও বোধহয় মেরি জানে।

জর্জ—সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে যে আমি ভালবাসি, সেটা তো তুমিও জান। তা না হলে তোমার মুখের দিকে…।

তপতী—আগে তাই জানতাম। কিন্তু এখন জানতে পারছি, আমার ধারণা ভুল।

জর্জ—তোমার সন্দেহটাই ভুল।

তপতী—একটুও ভুল নয়। ভালবাসা তোমার কাছে একটা অ্যাডভেঞ্চার মাত্র। যখন যেখানে সুবিধা…।

জর্জ—সাবধানে কথা বল তপতী।

তপতী—তুমি দ্বিতীয় ক্লাইভ, এদেশকে অপমান করতে এসেছ।

জর্জ—তোমার দেশ নিজেকে অপমানিত করবার জন্য ক্লাইভকে কাজে লাগিয়েছিল। ক্লাইভের দুর্ভাগ্য যে, সে এদেশে এসেছিল।

তপতী—তার মানে?

জর্জ—ক্লাইভের চরিত্রকে তোমার দেশই খারাপ করেছিল।

তপতী—কোন্ মূর্খ বলেছে একথা?

জর্জ—আমি বলছি, আমি, একজন মূর্খ হয়েও তোমার দেশের অনেক পণ্ডিতদের চেয়ে কম মূর্খ। যে বিদেশী এদেশে আসে, তাকে তোমরাই তোমাদের হীনতা দিয়ে আগে খারাপ করে দাও।

তাকে দিয়ে নিজের ঘরে আগুন লাগাও; তারপর তাকেই গালি দিয়ে বল অত্যাচারী, দস্যু, শঠ…।

তপতী—তার মানে ক্লাইভ একজন সেণ্ট ছিলেন?

জর্জ—ক্লাইভ ছিলেন ক্লাইভ। একটা বাজে ইংরেজ, একটা সাধারণ খারাপ মানুষ। কিন্তু তোমার দেশ তাকে আরও খারাপ করেছিল।

তপতী—তুমি তাহলে মেরি কস্টেলোদের বাড়িতে যাবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ?

জর্জ—যতদিন দরকার থাকবে, যাবই। তোমার গালাগালিতে ভয় পাব না।

তপতী—তোমার গালাগালিতে কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি।

জর্জ—তারপর?

তপতী—তারপর তুমি বুঝে দেখ।

জর্জ—আমি আর এখানে আসবো না?

তপতী—আমার ইচ্ছে; মেরি কস্টেলোকে বিয়ে করে তারপর এস।

জর্জ—কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, আজই তোমাকে বিয়ে করে মেরি কস্টেলোদের বাড়িতে একবার বেড়িয়ে আসি।

তপতী—জর্জ।

জর্জ—তুমি আমাকে জব্দ করতে পারবে না তপতী। তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও আমি ভালবাসবো।

তপতীর দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে টলমল করে।—আমাকে অপমান করবে না জর্জ, প্রতিজ্ঞা কর।

জর্জ বলে—আমাকে এমন সন্দেহ করো না তপতী; এতে যে আমাকে অপমান করা হয়।

তপতীর চোখের জলই যেন হেসে ওঠে। কী সুন্দর দেখতে

লাগছে জর্জের এই করুণ মুখটা। আর, জর্জের এই করুণ মুখের ভাষাতেও কী স্নিগ্ধ সান্ত্বনা!

তপতীকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে জর্জ, যেন একটা স্বপ্নময় আশাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

জর্জ বলে—এ কি! তোমার খোঁপাতে এ কোন্ ফুলের তেলের গন্ধ?

তপতী বলে—চামেলী।

কার্সিয়ং-এর নার্সিং হোম। তপতীর চিঠিটা বার বার তিনবার পড়েছেন হরেনবাবু। প্রথম দিন চিঠি পড়া শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে আর চোখ বন্ধ করে ইজি-চেয়ারটার উপর যেন একেবারে এলিয়ে পড়েছিলেন; যেন তাঁর চোখ দুটো এতদিন পরে তাঁর সাধের আশার ছবিটাকে দেখতে পাওয়ার সব ভরসা ছেড়ে দিয়েছে। তপতী বিয়ে করবে না। ভবতোষের বাড়িটা শুধু একটা দালান হয়ে পড়ে থাকবে; ওটা আর মানুষের কলরবের বাড়ি হয়ে জেগে উঠবে না।

তপতীর চিঠিটার মধ্যে যেন একটা আর্তনাদ নীরব হয়ে রয়েছে; ভাষার রকম দেখে সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

কেন মিছে আর এই আর্তনাদ! খুব ভুল করেছ তপতী; সারা জীবন ধরেই ভুল করে এসেছ। কাউকে আপন করে নিতে পারলে না; কারণ তুমি কাউকে আপন করবার নিয়মটাই জান না; যদিও তুমি এত শিক্ষিতা আর এত রোমান্সের সাহিত্য পড়েছ। নিয়মটাই বা তুমি জানবে কি করে? তোমার যে সে মনই নেই! এত বাছাই করে কি জীবনের দোসর পাওয়া যায়? খুঁত ধরতে গেলে শিবঠাকুর মশায়ও বোধহয় উমার মনপ্রাণ আর চেহারাটার

মধ্যে অনেক খুঁত ধরে ফেলতে পারতেন। শিবস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্যঃ—উমার অধর সুষমা লক্ষ্য করে যোগী শিবের মনও তাহলে আর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতো না ; কবি বাজে কল্পনা করেন নি.।

কিন্তু ভবতোষের এই মেয়েটি কী সাংঘাতিক ধৈর্যের মেয়ে! শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু চেষ্টা করে পার করে দিতে পেরেছে। নির্ভয়ে ভালবাসতে পারা যায়, এমন কোন মানুষকেই দেখতে পেল না। এত সাংঘাতিক ধৈর্যের ফল শেষে এই দাঁড়ালো, এই চাপা আর্তনাদের চিঠি। ধৈর্যের উপহার, একলা হয়ে পড়ে থাকবার একটা জীবন।

কিন্তু তুমি তো সে গল্প শুনেছিল তপতী ; তোমার বাবা যে জয়াকে শুধু একবার চোখে দেখেই প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, জয়াকে বিয়ে করতে হবে। ভবতোষ কি জয়াকে পেয়ে সুখী হয়নি? না, ভবতোষকে পেয়ে জয়া সুখী হয়নি ? অমন সুন্দর ভালবাসার জীবন পাওয়া ক'টা স্বামী-স্ত্রীর সৌভাগ্য হয়েছে ?

যাক্, যখন চরম পরিণাম বুঝতে পেরেছ তপতী, তখন আমার আর কিছু বলবার নেই। এখন শুধু ভেবে দেখ, ভবতোষের বাড়িটাকেও একটা শিশু-হোম করে দিলে কেমন হয় ? তুমি একটা মেয়ে-হোস্টেলে গিয়ে ঠাঁই নিয়ে আর কলেজের ছাত্রী পড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দাও। ভবতোষের বাড়িটাকে গবর্ণমেণ্টের নামে গিফট্ করে দাও ; যেন সেখানে দেশের অনাথ শিশুদের একটা আশ্রম গড়ে তোলেন গবর্ণমেন্ট। হ্যাঁ, একটি সর্ত রেখে দানের ডীড তৈরী করবে—বিলিতী রক্তের ছোঁয়া আছে, এমন কোন শিশু যেন সেখানে ঠাঁই না পায়।

বোধহয় তপতীর কাছে চিঠি লেখবারই জন্যে চেয়ারের উপর ধড়ফড় করে নড়ে বসেন হরেনবাবু, চোখ মেলে তাকান।

বুঝতে পারেননি হরেনবাবু, ডাক্তার ভদ্রলোক কখন্ এসে এত কাছে দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার একটু উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করেন—আজ কি একটু বেশি কাহিল বোধ করছেন ?

হরেনবাবু—কই ? সে-রকম বিশেষ কিছু বোধ করছি না। তবে কাহিল তো হয়েই আছি। বয়সটা কাহিল, প্রাণটা কাহিল, আর আশাটাও কাহিল।

ডাক্তার—আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, আপনি যেন একটা দুঃখ চেপে কথা বলছেন।

—কি বললেন ? দুঃখ চেপে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা, নিতান্ত ভুল বলেননি। জীবনের একটা শূন্যতা সহ্য করতে খুবই কষ্ট হয়েছে। সে শূন্যতা দূর করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি; মনটাকেও নতুন করে তৈরী করে নিয়েছিলাম; খুব আশাও করেছিলাম, সে শূন্যতা একদিন কেটে যাবে; কিন্তু··· কাটলো না।

"আমার কেউ নেই ডাক্তার। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, তখন আমার বয়স তোমার চেয়েও কম। আমার প্রথম সন্তান প্রাণহীন হয়েই পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল; আর আমার স্ত্রী সেই প্রাণহীন ছেলেকে শুধু একবার চোখে দেখে নিয়েই চিরকালের মত চোখ বন্ধ করেছিল। সে আর হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে আসেনি।"

"আমি কিন্তু দমে যাইনি, ডাক্তার। আমার ঘরে ছেলে এল না; আমার ঘরে আমার সংসার-সুখের কলরব জাগলো না, কিন্তু সে-জন্যে চুপ করে পড়ে থাকিনি। আমার বাড়িকে পরের ছেলে-মেয়েতে ভরে দিয়েছি।

ডাক্তার চোখ বড় করে তাকায়—তার মানে ·।

হরেনবাবু মৃদুভাবে হাসেন—তার মানে ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়েরা বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখে।

ডাক্তার হাসেন—দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছেন। বেশ ক্লেভার কম্প্রোমাইজ! ভাড়াও পাচ্ছেন অথচ··।

হরেনবাবু—না ডাক্তার; ভাড়া এমন কিছু পাই না। তা ছাড়া, ওরা নিয়ম মত ভাড়া দিতেও পারে না। যা দেয়, তাই···।

ডাক্তার যেন একটু লজ্জিত হয়ে বলে—তাই বলুন!

হরেনবাবু—বাড়িটাকে অবিশ্যি দান করে দিয়েছি ডাক্তার; আর ব্যাঙ্কের খাতায় যা-কিছু আছে, তাও সব দান করে দিয়েছি। আমি যখন থাকবো না, তখন গবর্ণমেণ্ট আমার ঐ বাড়িটাকে একটা শিশু-আশ্রম করে নেবে; আমার সব টাকা ও-কাজেই গবর্ণমেণ্ট খরচ করবে।

ডাক্তার এবার বিস্মিত হয়ে, আর যেন অপরাধীর মত বেশ একটু অনুতপ্ত হয়ে, যেন মার্জনা চাইবার ভঙ্গীতে কথা বলে।—তাই বলুন, তাই বলুন। আমি আপনাকে ভুল করে বেশ একটু ভুল বুঝে ফেলেছিলাম। আপনি সত্যিই মহৎ কাজ করেছেন।

হরেনবাবু—চালাক জোচ্চোরের মত নয়; তবে চালাক ফিলসফারের মত একটা কাজ করেছি বটে। কিন্তু দেখলাম, ওতে পেট ভরছে না, ডাক্তার। দুধের সাধ ঘোলে মেটে না। আমার বাড়িটা যদি পৃথিবীর সব শিশুর বাড়ি হয়ে যায়, তবুও মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে আমি যেন নেই। তার মানে, নিতান্ত আমার মায়া বলে কোন সত্য ওর মধ্যে নেই।

ডাক্তার—কিন্তু আপনার মত উদার মানুষের মনে এরকম ভাব থাকা তো উচিত নয়।

হরেনবাবু হাসেন—উচিত নয় কিনা জানি না। কিন্তু না

থাকলে মন্দ হতো না। তাহলে একটা শূন্যতার পাল্লায় পড়তে হতো না।

ডাক্তার—আপনার নিজের ছেলে-মেয়ে যখন নেই, তখন আর আপন সংসার নামে একটা মায়ার ছবি…অর্থাৎ ..আমি ফিলসফি বুঝি না স্যার…তাই বুঝিয়ে বলতে পারছি না…তাহলে আপনাকে একটু শূন্যতা ভুগতেই হবে।

হরেনবাবু—তবু, আর একটা চেষ্টা করেছিলাম ডাক্তার। এটা ঠিক দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত ক্লেভার কম্প্রোমাইজ নয়। বলতে পার, পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া। অর্থাৎ, আমার বন্ধু ভবতোষের ছেলে-মেয়েগুলোকে আমার ছেলে-মেয়ের মত আপন বলে ভেবে নিতে পেরেছিলাম। আর আশাও করেছিলাম যে, ভবতোষের বাড়িতেই·· অর্থাৎ আজ আমার এখানে এসে এই নার্সিং হোমে পড়ে থাকতে হতো না ডাক্তার, আমি আজ ভবতোষের বাড়িতে বসে যত নাতি-নাতনীর ভিড়ের মধ্যে বসে · হ্যাঁ একটা আপন মায়ায় সংসারের স্বাদ পেতে পারতাম। কিন্তু হলো না। ভবতোষের মেয়েটিও শেষ পর্যন্ত বিয়েই করলে না।

ডাক্তার—ভবতোষবাবুর ছেলেরাও কি··।

হরেনবাবু—না, তারা বিয়ে করেছে। কিন্তু·· তারা ভবতোষের আশাটাকে, ভবতোষের স্ত্রী জয়ার সাধের স্বপ্নটাকে, আর আমার শুভেচ্ছার দাবিটাকেও অপমান করেছে। তারা আমাদের জাতিটাকেই অপমান করেছে ডাক্তার।

ডাক্তার—কিছুই বুঝলাম না স্যার।

হরেনবাবু—ভবতোষ আজ আর বেঁচে নেই, ভবতোষের স্ত্রী জয়াও নেই, তাদের তিন ছেলে এখন বিদেশে থাকে; এক একজন বিদেশিনীকে ওরা জীবনসঙ্গিনী করেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে। ভবতোষের বাড়িটা শূন্য।

ডাক্তার—দুঃখের কথা বটে।

হরেনবাবু—ভবতোষের বাড়িটা শূন্য হয়ে গেল ; এটাই আমার দুঃখের একমাত্র কারণ নয় ডাক্তার। ভবতোষের তিন ছেলে, যাদের আমি নিজের ছেলের মত আপন-জন বলে মনে করতাম, তারা যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে বাড়িটাকে শূন্য করে দিত, তবে আমার কষ্ট হতো ঠিকই, কিন্তু অপমানিত বোধ করতাম না।

ডাক্তার—আজ্ঞে ?

হরেনবাবু—অপমানিত বোধ করতাম না। আমার বন্ধু ভবতোষ জীবনে একবার মাত্র অপমানিত হয়েছিল, ঐ শ্বেতচর্মা এক বিদেশিনীরই কাছে।

—আজ্ঞে ? ডাক্তারের কৌতূহল যেন দপ্ করে চমকে উঠেছে।

—না, প্রেম-ট্রেমের অপমানের ব্যাপার নয় ; মনুষ্যত্বের অপমান। ভবতোষ বেচারার মনুষ্যত্বকে কি-ভয়ানক ঘৃণায় অপমান করেছিলেন সেই ইংরেজ মহিলা।…ব্যাপারটা হলো, ভবতোষের বয়স তখন কুড়ি-বাইশ হবে। এক ইংরেজ সাহেবের অফিসে তখন চাকরি করতো ভবতোষ। বড় সাহেবের নাম মিস্টার টেম্পল্। একদিন বড় সাহেবের বাড়িতে ফাইল পৌঁছাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল ভবতোষ, মিস্টার টেম্পলের মেয়েটা…ফুটফুটে সুন্দর একটা দু'বছর বয়সের মেয়ে…ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভবতোষটা খপ্ করে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়েছিল। কিন্তু…

হরেনবাবুর শিথিল ভুরু দুটো হঠাৎ যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে।—মিসেস টেম্পল্ হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ভবতোষের দিকে কটমট করে তাকিয়ে যেন একটা হুংকার ছাড়লেন—নেটিভের কী দুঃসাহস। তোমাকে একটা গ্রেট মূর্খ বলে মনে হচ্ছে, তাই তোমাকে ক্ষমা করলাম। তখুনি সাবান জল দিয়ে মেয়েটার মুখ ধুয়ে দিয়ে, তোয়ালে দিয়ে বারবার মুছে আর ইউকালিপটাস তেল

মাখিয়ে···আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না ডাক্তার। মেয়েটার মুখে জুতোর কাদা লাগলেও মিসেস টেম্পল্ বোধহয় এতটা আতঙ্কিত হয়ে মেয়েটার মুখটাকে ধোয়া-মোছা করতেন না।

ডাক্তার স্তব্ধ ভাবে বিড়বিড় করে—কী সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ।

হরেনবাবু—সাংঘাতিক হলো ওদের গায়ের রক্ত। অহংকার আর ঘৃণা ওদের রক্তে থৈ-থৈ করছে। শুধু আমাদের ভবতোষকে নয়, এই ভারতের সব ভবতোষকেই ওরা পশুর চেয়েও নীচু প্রকারের জীব বলে মনে করে।

হরেনবাবু হঠাৎ হেসে ফেলেন—কিন্তু ভবতোষের ওপরেও সেদিন বেশ রাগ হয়েছিল।

ডাক্তার—হবারই কথা। সাহেবের মেয়েকে আদর করবার লোভটা ওর না হলেই ভাল ছিল।

হরেনবাবু—না, সে জন্যে নয়। রাগ হয়েছিল এই কারণে যে, মিসেস টেম্পলের কাণ্ড দেখেও ভবতোষটা একটুও রাগ করেনি। বরং, বেহায়ার মত আমাকে কি বলেছিল জান?

ডাক্তার—কি?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললে, আমি কিন্তু মুখ ধুয়ে ফেলতে পারবো না হরেন। চুমোর স্বাদ মুখে লেগে থাকুক।

হেসে ফেলে ডাক্তার—তারপর?

হরেনবাবু—তারপর আর কি? আমার কাছ থেকে যে গালাগালি শুনেছিল ভবতোষ, সে রকম কড়া গালাগালি আমি জীবনে কাউকে দিই নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার এত শক্ত শক্ত কথা আর গালাগালির উত্তরেও ভবতোষ শুধু হেসেছিল; ওরকম অদ্ভুত হাসিও আমি কখনও দেখিনি।

ডাক্তার—সত্যি অদ্ভুত।

হরেনবাবু—সে-সময় আমার সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল,

পড়বার জন্য অক্সফোর্ড যাব। কিন্তু···সেই দিনেই প্রতিজ্ঞা করলাম, যাব না। যে জাত আমাদের এত ঘেন্না করে, সে-জাতের দেশে যেতে আমিই বা ঘেন্না করবো না কেন?

হরেনবাবু হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে আবার যেন আনমনার মত দূরের কুয়াশার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা আবার হঠাৎ কেঁপে উঠেই যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—আমিও সে-সময় আইন পাশ করে এক সাহেবের ফার্মে চাকরি করছিলাম। কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ডাক্তার—রাগ করে?

হরেনবাবু—রাগ করে তো বটেই; আরও একটা কাণ্ড দেখে। একদিন আসানসোলের রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই কাণ্ডটা দেখেছিলাম। থার্ড ক্লাসের একটা কামরার ভিতরে তীর্থ-যাত্রিণী বুড়িদের একটা ভিড় ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছিল; আর সব কামরাতেও ভিড় ছিল। এক দল গোরা সোলজার ঐ ট্রেনে জায়গা নেবার জন্য এই কামরা থেকে সে-কামরার দরজায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে ছুটোছুটি করছিল। খুব রেগে উঠেছিল গোরারা। এক জন স্টেশন মাস্টারের অফিসের দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে গিয়ে ঝগড়া বাধালো। স্টেশন মাস্টার বিড়বিড় করে কি বললেন, শুনতে পাইনি। কিন্তু দেখলাম, গোরা সোলজারের দল সেই তীর্থযাত্রিণী বুড়িদের কামরার ভিতরে ঢুকে আর লাথি মেরে সব পোঁটলা-পুঁটলি ফেলে দিল। বুড়িরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেও গোরারা বুড়িদের গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কামরা থেকে নামিয়ে দিল। আমি সহ্য করতে না পেরে একটা গোরাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলাম। পুলিশ তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল; আর আদালতে আমার তিনশো টাকা জরিমানাও হয়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে দুঃসহ ব্যাপার কি হয়েছিল জান, ডাক্তার?

—বলুন, শুনি।

হরেনবাবু—ভবতোষ আমার এই লাঞ্ছনার ঘটনার সব রিপোর্ট শুনেও হেসে ফেলেছিল।

—কেন?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললো, গোরা সোলজারগুলোর উপর আগে রাগ না করে, স্টেশনমাস্টার করালীবাবুর উপরেই আগে তোমার রাগ করা উচিত ছিল।

—কেন?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললে, আমি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিনি, তবু বুঝতে পারছি, করালীবাবু পরামর্শ না দিলে গোরা ব্যাটারা বোধহয় বুড়িদের কামরায় ঢুকে ওরকম ইতরতা করতো না।

হেসে ফেলে ডাক্তার—ভবতোষবাবু সব ব্যাপার বোধহয় একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন?

হরেনবাবু—মোটেই না। ইংরেজ জাতের কোন দোষ ধরতে ভবতোষের যেন সাহসে কুলতো না। এটাই ছিল ওর চরিত্রের সব চেয়ে বড় ভুল। আমি কিন্তু···সত্যি কথা বলতে গেলে, কতকটা ভবতোষের এ ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধেই রাগ করে, সাহেবের অফিসের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ডাক্তার—ভালই করেছিলেন, আপনি আপনার মনের মত কাজ করেছিলেন।

হরেনবাবু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো ডাক্তার? ভবতোষের সংসার-সুখের উপরেই কত বড় ঠাট্টা আর অপমান সত্য হয়ে উঠলো। বিজাতের উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালের মত এক-একটা জীবন নিয়ে বিদেশে পড়ে আছে তার তিন ছেলে। ভবতোষ আজ বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতো, তার সেই অদ্ভুত হাসিটা আজ কত স্তব্ধ হয়ে, তারই বাড়িটাকে শূন্য করে দিয়েছে। ভবতোষের তিন ছেলে

ভবতোষের জাতের রক্তকেও অপমানিত করেছে। ভবতোষের দেশ আর জাতকে একদিন আরও বেশি অপমান আর ঘেন্না করবে ঐ ওরাই, ঐ তিন ছেলের ছেলে-মেয়েরা।

বলতে বলতে হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন হরেনবাবু—যাই হোক্, ভবতোষটা মরে বেঁচেছে। এ শূন্যতা সহ্য করবার দুর্ভাগ্য ওর হলো না। কিন্তু আমাকে সে দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হচ্ছে।

ডাক্তার—আমার মনে হয়, এ বয়সে আপনার এখন এসব চিন্তা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

হরেনবাবুর চোখ দুটো আবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—তুমি হয়তো আমার এসব চিন্তার মধ্যে একটা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছো ডাক্তার। হতে পারে, তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু আমি জানি, সাদা জাতকে ঘেন্না করতেই আমার ভাল লাগে। এ ঘেন্না যাবার নয় ডাক্তার। কোন চিকিৎসাতেও আমার এ ঘেন্না চলে যাবে না। আমি জাতিবোধবিহীন একটা জীব মাত্র নই ডাক্তার।

ডাক্তার বলেন—আমি এখন চলি।...হ্যাঁ, আপনার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এবার থেকে আপনার রোজই সোডা-বাথ দরকার। আশা করছি, তাতে আপনার ঘুম ভাল হবে, আর শরীরটাও একটুতে কাহিল হয়ে যাবে না।

ঠিকই, আরামের ঘুমটা যেন হরেনবাবুর জীবনের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এই এক বছরের মধ্যে একটা রাতও গভীর ঘুমের শান্তি বোধ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আছে শুধু অদ্ভুত একটা তন্দ্রার ঘোর। জেগে থাকলেও যেন চোখের উপর একটা কুয়াশাময় আবরণ নেমে আসে। বুকটা যেন নিঝুম হয়ে যায়, আর এই জাগা পৃথিবীর

কোন শব্দ কানে শোনা যায় না। রিটায়ার্ড মিলিটারী আফিসার আয়েঙ্গার, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্যালিপলির অ্যাকশনে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ দেখিয়ে তিনটে কৃতিত্বের মেড্যাল পেয়েছেন যিনি, সে ভদ্রলোক তাঁর প্রিয় সহচর যে হাউণ্ডটাকে নিয়ে হরেনবাবুর চোখের সামনেই লনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটা চিৎকার করছে। কিন্তু হরেনবাবুর হঠাৎ তন্দ্রার জগতে হাউণ্ডের সেই চিৎকারটা যেন অনেকদূরের প্রতিধ্বনির মত, ক্ষীণস্বরের একটা সুরময় কুহকের মত রিমঝিম করে বাজতে থাকে। হঠাৎ চমকে ওঠেন, ধড়মড় করে নড়ে বসেন আর জোর করে চোখ মেলে তাকান হরেনবাবু।

চোখ দুটোও জলে ভরে গিয়ে চিকচিক করতে থাকে। কী দুঃসহ এই একলা হয়ে পড়ে থাকা জীবন। নিঃশ্বাসের তাপটুকুও যেন অদৃশ্য এক হিমভারের চাপে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বুকটাও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আজ একটা মমতাময় ছায়াও কাছে নেই যে, হাত বুলিয়ে এই ঠাণ্ডা বুকের নিঃশ্বাসটাকে একটু উষ্ণ করে দেয়।

যাক্, কোন মমতার ছায়া কাছে নেই; কিন্তু মমতার স্মৃতি নামে ছায়াময় একটা সত্য যে হরেনবাবুর এই ক্লান্ত আয়ুর শেষ-দিনের নিঃশ্বাসগুলির কাছে আছে। পূর্ণিমার মুখটা যে খুবই স্পষ্ট করে মনে করতে পারা যায়। তার মুখের হাসিটাকে যেন চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। ভালবাসায় ধন্য হওয়া একটা জীবনের স্মৃতি যে হরেনবাবুর এই নিঃসঙ্গতার সব শূন্যতার মধ্যেও লুকিয়ে আছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে।

কিন্তু ভবতোষের মেয়েটা? তপতী যে পৃথিবীর সঙ্গে কোন মমতার সম্পর্ক মেনে নিল না। ওর জীবনে ভালবাসার ঘটনা নেই; ওর স্মৃতিটাও যে রিক্ত শূন্য সাদা। এ মেয়ে তার একলা জীবনের ভার কিসের জোরে বহন করতে পারবে? এখনও বোধহয়

কল্পনা করতে পারছে না তপতী, শুধু নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা একটা জীবন যে বেঁচে-থাকা একটা মৃত্যু।

এ কি? হরেনবাবুকে ঘিরে-ধরে এত অভিমানের স্বরে ডাকা-ডাকি করছে কারা? কাকাবাবু, আপনি আমাদের একটা চিঠিরও উত্তর আজ পর্যন্ত দিলেন না। আমরা তো জানি, আপনি যতদিন আছেন, ততদিন আমাদের দেশও আছে। বাবা নেই, মা নেই, এখন আপনিই তো আমাদের আশীর্বাদ। ছেলে-মেয়েগুলো যে আপনার ফটো দেখতে চায়।

এ কি সত্যিই তন্দ্রার ছবি? চমকে ওঠেন হরেনবাবু। দু'হাতে চোখ মোছেন। মনে হয়, বুকের ভিতরে কি যেন আটকে রয়েছে। অমল বিমল আর শ্যামলকে কি-যেন বলতে গিয়ে কথাটাই বুকের ভেতর আটকে গিয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে।

চমৎকার একটা ঠাট্টার ছবি। হরেনবাবুর মনটাই যেন বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে।

যাই হোক্, তপতীর চিঠির উত্তর আজই লিখে ফেলতে যে পারা যাচ্ছে না। কি লিখতে হবে, তাও যে ভেবে উঠতে পারা যাচ্ছে না। সারাটা জীবন একলা হয়ে পড়ে থাকবে তপতী, আর সত্তর বছর বয়স হলে কার্সিয়ং-এর এই হোমে এসে অন্তিমের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনবে, তপতীর এমন একটা অদৃষ্টকে কি আশীর্বাদ করা যায়?

শোনা গুজব নয়; পরের মুখে ঝাল খাওয়া একটা মিথ্যে উপলব্ধিও নয়; নীরুদি নিজের চোখেই দেখেছেন, আর লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছেন।

অল্পবয়সের এক ইওরোপীয়ান ছোকরার সঙ্গে ময়দানের রেড রোডের কিনারা ধরে হেসে-হেসে আর গল্প করে করে চলে যাচ্ছে

তপতী। প্রথমে মনে হয়েছিল, প্রায় তপতীর মত দেখতে একটা মেয়ে সাহেবটার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। তার পরেই মনে হয়েছিল, একদিন তপতীটাও তো দেখতে ঠিক এই-রকমই ছিল। অনেকদিন আগের তপতী, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটার পর যেদিন নীরুদির সঙ্গে এই ময়দানেই বেড়াতে এসেছিল তপতী, তপতীর বয়স তখন বোধহয় কুড়ি বছরের বেশি ছিল না। ফিকে নীল ভয়েলের শাড়ি আর ডবল বিনুনীর দু'প্রান্তে দুটো মেরি রোজ ঝুলছে, টাটকা ফোটা ফুলের মত চেহারা তপতীটা সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে বনহরিণীর মত ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করেছিল।

কিন্তু সেদিনটা তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের একটা দিন! আজ আর সে তপতীকে চোখে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবু যে দেখতে পাওয়া গেল। না, কোন ভুল নেই, ঠিক, কোন সন্দেহ নেই, তপতীই যাচ্ছে। নীল রঙা বেনারসী সিল্কের শাড়ি আঁটসাট করে গায়ে জড়ানো; সত্যিই যে ডবল বিনুনী; আর বিনুনীর প্রান্তে শিউলির মালা জড়ানো।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাবার জন্য বলতে গিয়েও নীরুদি চুপ করে গেলেন। বোধহয় বেশ ভয় পেয়ে ছিলেন, তাই। গাড়ির দিকে একবার তাকিয়েও দেখলো না তপতী, কে চলে গেল গাড়িতে। কিংবা, দেখে থাকলেও বোধহয় চিনতে পারলো না। তপতীর চোখ দুটো যেন নিজের চোখের আলোতেই মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। হাসছে, ঝিকঝিক করছে।

যাদবপুরের পিসিমা একদিন এসেছিলেন; সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ফটক পার হয়ে আর বারান্দায় উঠে, আর একটা হাঁপ ছেড়ে একটা মিনিট একটু জিরিয়ে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনেক কথা বলবার, অনেক কিছু জানবার, আর একটা শুভ

ঘটনার সংবাদ জানাবার জন্য তিনি এসেছিলেন। অমল, শ্যামল আর বিমলের খবর কি? সরসী কি এবছরেও দেশে ফিরবে না? পুরো পাঁচটা বছর তিনি ভবদার বাড়ির কোন খবর নিতে পারেন নি; কারণ, এই পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি পাঁচবার যাদবপুর ছেড়ে অনেক দূরে দূরে গিয়ে হাওয়া বদল করে এসেছেন: উটিতে, পাঁচমারিতে, সিমলাতে, শিমূলতলায় আর ওয়ালটেয়ারে। মেজ মেয়ে সরযূর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। শুভ ঘটনার সংবাদটা তপতীকে জানিয়ে দিয়ে বলে যেতে হবে, তপতী যেন নিশ্চয়ই বিয়ে দেখতে যায়। না-যাবার কোন অজুহাত শুনবেন না যাদবপুরের পিসিমা।

কিন্তু তপতী কোথায়? ভবদার বাড়িটা যেন শূন্যতার ভারে মুখভার করে নীরব হয়ে রয়েছে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত সত্যি বিয়েই করলো না। চিরকাল পুরুষ জাতকে ভয় পেয়ে আর ঘেন্না করেই সরে রইল। অনেকবার কথাটা শুনেছেন যাদবপুরের পিসিমা, চারুর মেয়ে অমিতা কতবার তপতীর সম্পর্কে কলেজ-ছাত্রীদের এই সন্দেহের কথাটা যাদবপুরের পিসির কাছেও বর্ণনা করে বলেছে। মাস্টারণী হবার পর থেকে যেন আরও একরোখা হয়েছে তপতী। শুধু বই-পড়া আর পড়ানো; শুধু কলেজ আর বাড়ি ফিরে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে পড়ে থাকা— ভবদার মেয়ে তপতীর জীবন এরকম একটা অদৃষ্ট তৈরী করে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

খানসামা পাঁচকড়ি এসে কথা বলতেই কেঁপে উঠলেন যাদবপুরের পিসি। তপতী বাড়িতে নেই। কলেজও যায়নি, কারণ এই সময়টা কলেজ যাবার সময় নয়। পাঁচকড়ি বলে—সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে গিয়েছেন দিদিমণি।

—সাহেব?

—হ্যাঁ পিসিমা। একটি ফুটফুটে সাহেব; চমৎকার বাংলা কথা বলে।

—কিন্তু একটা সাহেবের সঙ্গে তোমার দিদিমণির কাজটা কি? শুনি?

—জানি না পিসিমা। চাকর-বাকরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই পিসিমা।

পিসিমার বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু, আর এক মুহূর্তও দেরি করেন না পিসিমা। আতঙ্কিতের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক-ভাবে তাকিয়ে থেকেই বারান্দা থেকে নেমে পড়েন। গেট পার হয়ে নিজের গাড়িতে উঠেও হাঁপাতে থাকেন।

একদিন অমিতা এসেও চমকে উঠলো; তারপরেই অপ্রস্তুতের মত, আর যেন বোবা হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অমিতার সঙ্গে অমিতার স্বামী বিলাসও এসেছিল।

ড্রইং রুমের ডিভানের উপর পাশাপাশি বসে আছে তপতী আর এক যুবক ইওরোপীয়ান; ইংরেজ না জার্মান না ফ্রেঞ্চ, কে জানে?

—তপতী; হেসে হেসে ডাক দিতে গিয়েই অমিতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বিলাসও অমিতার কানের কাছে ফিসফিস করে—সাহেবটাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে।

আরও আশ্চর্য, তপতী একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে, একটুও গম্ভীর না হয়ে, স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে এগিয়ে এসে অমিতার হাত ধরে। আর, ব্যস্তভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ঘরে অমিতাকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলে। বিলাসকেও অনুরোধ করে —চা না খেয়ে চলে যাবেন না বিলাসবাবু।

চা আসা পর্যন্ত এই ঘরের ভিতরেই বসে থাকে অমিতা আর বিলাস। তপতী তিন বার চলে যায়; আর তিন বার ফিরে আসে। কতরকমের নতুন কথা শোনাতে থাকে তপতী। জাকার্তাতে সরসী এখন বড় বড় গামেলাং-এর আসরে গান গায় আর নাচে। ওদেশী ভাষার গান আর ওদেশী নাচ চমৎকার রপ্ত করেছে সরসী। ইন্দোনেশিয়ার সরকার সরসীকে তিনটে সার্টিফিকেট অব মেরিট দিয়েছে। হ্যাঁ, বাগানটার চেহারা বদলে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ অমিতা, সেই কসমসের আর ক্যাকটাসের জঙ্গল আর নেই; এখন শুধু শিউলি, টগর, জুঁই আর কামিনী।

দেশী ফুলের উপর এত বড় অনুরাগের কথা এত মুখর হয়ে বলে চলেছে যে তপতী, তারই বাড়িতে ঐ ড্রইংরুমের ভিতরে যে একটা বিদেশী মনুষ্যত্ব শক্ত হয়ে বসে রয়েছে। তপতীর উল্লাসের ভাষাটাকে যেন একটা পাগলাটে আহ্লাদের প্রলাপের মত মনে হয়। তপতীর কথা আর কাজের মধ্যে যেন কোন নিয়মের, কোন মিলের বালাই নেই।

এত কথা বলছে তপতী, কিন্তু ভুলেও একবার বললো না, ওঘরে বসে আছেন ঐ সাহেব ভদ্রলোকটি কে? কেন এসেছেন? তপতীর কাছে বিদেশী ছোকরাটার কাজই বা কি?

শেষ পর্যন্ত সত্যিই তপতী সামান্য একটা কথা খরচ করেও বলতে পারলো না, কে ঐ সাহেব ভদ্রলোক। বিলাসের সঙ্গে সাহেব ভদ্রলোকের একটু পরিচয়ও করিয়ে দিলো না। তপতীর আচরণ যেন বেশ সূক্ষ্ম একটা সতর্কতার আচরণ। যেন কিছু গোপন করে রাখবার জন্য বেশ সাবধান আর চতুর একটা আচরণ। যেন একটা পরম প্রাপ্তির রত্নকে সবার গোচর থেকে আড়াল করে ঢেকে রাখতে চাইছে তপতী।

বিলাস বিরক্ত হয়, অমিতা বেশ লজ্জিত হয়। আর, চা

খাওয়া শেষ হতেই দু'জনে উঠে পড়তে আর এক মুহূর্তও দেরি করে না।

সুমঙ্গলা ভেবেছিল, তপতীকে একটা চিঠি লিখে জেনে নেবে, ব্যাপারটা কি? সত্যিই কি, যে অদ্ভুত কথাটা রটেছে, সুমঙ্গলার বান্ধবী, এত সাবধান আর শক্ত মনের মেয়ে সেই তপতী কি এরকম একটা কাণ্ড করে এই বয়সের জীবনটাকে লজ্জা দিতে পারে? এ কি সম্ভব?

সুধাময়বাবু দু'বার এসে সুমঙ্গলার স্বামীর কাছে গল্প করে গিয়েছেন। জর্জ ক্রিস্টফার নামে এক ইংরেজ ছোকরার সঙ্গে তপতীর নাকি বড় বেশি অন্তরঙ্গতা দেখা দিয়েছে। সুধাময়বাবু ভয়ানক ঠাট্টার সুরে হেসে হেসে যে-কথা সুমঙ্গলার স্বামীকে বলছিলেন, সে-কথাটা সুমঙ্গলা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেয়েছিল।

—এইবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন অনিমেষবাবু, তপতী মল্লিককে বিয়ে করতে কেন আমি রাজি হইনি। আমার ঘোর সন্দেহ ছিল, এত বয়স হয়েও যে-মেয়ের বিয়ে হয়নি, সে-মেয়ে কি এতদিনের মধ্যে একটুও এদিক-ওদিক করেনি? একেবারে ক্লীন স্লেট, কোন আঁচড়ও পড়েনি? বিশুদ্ধ টেবুলা রেজা? কোন রেকর্ডই নেই? হতেই পারে না অনিমেষবাবু।

সুমঙ্গলার স্বামী অনিমেষ কবুতরের রোষ্ট চিবোতে চিবোতে হাসেন।—অর্থাৎ একটু স্পাইস্‌ড্ মাটন, একেবারে র মাটন নয়; কিন্তু আপনি তো অতীতের কোন রেকর্ডের কথা বলছেন না; যেটা বলছেন, সেটা তো নিতান্ত সাম্প্রতিক।

সুধাময়—তা বটে; কিন্তু সেটাই কি প্রমাণিত করে না যে, মহিলার জীবনে আরও কত রেকর্ডের দাগ আছে; যেগুলি কারও চোখে ধরাই পড়েনি?

—যাই হোক্, আপনার আর এবিষয়ে কিছু করবারই বা কি অধিকার আছে ?

—কিছু নয়। শুধু লজ্জা পেতে হচ্ছে, এহেন মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল।

শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনেছে সুমঙ্গলা। সুমঙ্গলার স্বামী অবশ্য তপতীর কথা নিয়ে সুমঙ্গলার কাছে কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু সুধাময়বাবুর ঠাট্টার হাসি আর ভাষাটা যেন একটা অপমানের কাঁটার মত সুমঙ্গলার মনটাকে বিঁধে বিঁধে যন্ত্রণা দিয়েছিল। ছিঃ, তপতীর মত মেয়ে কি এমন ভুল করতে পারে ? সুমঙ্গলা তার অনেক বান্ধবীর জীবনের অনেক ঘটনার কথাই জানে। ছাত্রী-জীবনের বান্ধবীদের কথাও মনে আছে। মাধুরী, বিরজা আর হিমানী কলেজের মাত্র চারটি বছরের পড়াশোনার জীবনেই যে-সব কাণ্ড বাধিয়েছিল, সে-সব কথা ভুলে যায়নি সুমঙ্গলা। কিন্তু এই সত্যও ভুলে যায়নি, তপতী কোনদিন সে-ভুল করেনি। সেই জন্যেই তো তপতীকে এত ভাল লাগতো।

না, সোজা গিয়ে তপতীকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।

সুমঙ্গলা এসে সটান ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেও কাউকে দেখতে পায় না। কিন্তু তবু চমকে ওঠে। ড্রইংরুমের একটা ডিভানের উপর একটা হ্যাট আর মোটা একটা বই পড়ে আছে, কালিদাসের কাব্যের একটা ভল্যুম। হ্যাঁ, টেবিলের উপর একটা ট্রের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা পাইপ; পাইপের মুখের ভিতরে তখনো ঠাসা তামাকের মিক্সচার ধিকিধিকি করে জ্বলছে, ধোঁয়া উড়ছে।

নীচের তলার কোন ঘরে কেউ নেই। উপর তলায় ওঠবার সিঁড়িতে কেউ নেই। উপরতলার কোন ঘরেও কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে। সব ঘরেই দরজা খোলা, পর্দাগুলি দুলছে। কিন্তু

কোথাও কোন কথার শব্দ বাজছে না, কোন মৃদু স্বর, কোন হাসির উচ্ছ্বাস, একটা ফিসফাসও শোনা যায় না।

কিন্তু···সুমঙ্গলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃশ্বাসটাও যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি ঘর, যে-ঘরটা তপতীর বেডরুম, সেটারই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তপতীকে ডাক দেবার মত শক্তিটাও যেন সুমঙ্গলার কণ্ঠস্বর থেকে হঠাৎ আতঙ্কে উবে গিয়েছে। ডাক দেবার সাহস নেই, সাধ্যি নেই। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু সন্ত্রস্ত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে সুমঙ্গলা, তারপরেই ছুটে পালিয়ে যায়। সিঁড়ি ধরে একেবারে নীচের তলায়, তারপরেই বারান্দা ছাড়িয়ে একেবারে ফটকের কাছে। সুমঙ্গলার গাড়িটা উধাও হবার আগে গাড়ির হর্ণটাও যেন আতঙ্কের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

পাইপ ঠুকে পোড়া তামাকের ছাই ফেলে দিয়ে, আর প্রকাণ্ড বইটা হাতে তুলে নিয়ে যখন রওনা হয় জর্জ ক্রিস্টফার, তখন ডিভানের উপর যেন একটা পরিশ্রান্ত তৃপ্তির মূর্তির মত অদ্ভুত রকমের একটা শিথিল অথচ স্নিগ্ধ হাসি হেসে তপতী বলে—আমি আর উঠতে পারবো না জর্জ। তুমিই কাছে এসে···।

এগিয়ে আসে জর্জ, আর তপতীর হাত ধরে বলে—আজ তাহলে আসি, তপতী।

তপতী—আর কিছু বলবার নেই ?

জর্জ—আমার আর কিছু বলবার নেই। এবার যা বলবার হয়, তুমি বলবে। একেবারে স্পষ্ট করে বলবে।

জর্জ ক্রিস্টফার নয়, যেন তপতীর ভাগ্যটাই স্নিগ্ধ হয়ে, প্রসন্ন হয়ে, বিপুল এক প্রতিশ্রুতির ঘোষণা শুনিয়ে কথা বলছে। জর্জ ক্রিস্টফার যেন দুরন্ত ভালবাসার জগতের এক নিঃসঙ্গ পথিক ;

আর তপতী যেন একটা ছায়াবীথি। সে ছায়াবীথির সব ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে পথিকের প্রাণ।

চলে যায় জর্জ; আর তপতী যেন তার মন-প্রাণের, আর এই শরীরেরও সব তৃপ্তি, নির্ভয় আনন্দে বরণ করে নিয়ে, যেন একটা স্বপ্নালু আবেশের মধ্যে দুই চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি ঝরেছে। বাগানের টগর আর গন্ধরাজ যেন নতুন জলে স্নান করে আরও সাদা হয়েছে; তাই দেখা যায়, অন্ধকারের মধ্যে ধবধব করছে ফুলগুলির সাদা দেহের হাসি।

কিন্তু·· তপতীর শুধু চোখ দুটো নয়, মনটাও যেন ফুলগুলির ঐ টাটকা সাদা হাসির ধবধবে গৌরবের ছবি দেখে চমকে উঠেছে। এই কাদাটে বর্ষার অন্ধকার যেন ওদের স্পর্শ করতে পারছে না। ওরা যেন এক একটা শুচিতার অহংকারের মত ফুটে রয়েছে।

তপতী মল্লিকের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা যন্ত্রণার সাপ যেন মোচড় দিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে। বুকটা ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। আজকের এই বর্ষার সন্ধ্যার কোন স্নিগ্ধতার আর শুচিতার ধারা নয়; এক গাদা কাদা ছিটকে এসে তপতীর প্রাণে আর গায়ে লেগেছে। কোথা থেকে একটা হিংস্র পাগলামি এসে তপতী মল্লিকের এই শান্ত বয়সের দেহটাকে একটা ভয়ানক লোভের উৎসবের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সব লজ্জার সর্বনাশ করে দিল! এখনও যে মনে পড়ে, এই তো দশ বছর আগের কথা, জোলার এক উপন্যাসে এক প্রবীণার জীবনের ঠিক এমনতর একটি ঘটনার কাহিনী পড়ে তপতীর মনটা কেমন ঘিনঘিন করে উঠেছিল। সে নারীকে নারী-জীবনের রীতি-নীতি থেকে পলাতকা এক নির্লজ্জা ভ্রষ্টা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ? আজ তপতী মল্লিকও

যে নারীর জীবনের সব চেয়ে বড় সতর্কতার শাসনটাকেই ছিন্নভিন্ন করেছে। কলেজের ছাত্রীরা যে আজও তপতীকে পুরুষদ্বেষিণী বলে ঠাট্টা করেও একটা সম্মান দিয়ে ফেলে। ওরা যে কোন দুঃস্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না, এই ঠাট্টা কত বড় মিথ্যা! ওরা বিশ্বাসই কবতে পাববে না যে, পুরুষের স্পর্শলোভিনী এক নারী শুধু ঢং করে পুরুষবিরোধী তত্ত্বকথা বলে। এ তত্ত্বটা ৺পতীর জীবনের একটা অভিমানের কান্নার তত্ত্ব। তা না হলে, জর্জ ক্রিস্টফারকে এতটুকু বাধা না দিয়ে, বরং যেন মাতালের খুশির নেশার মত একটা বিহ্বলতার সুখে সব কাণ্ডজ্ঞান হাবিয়ে আর একেবারে অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে কেন, তপতীর এই অহংকারের শরীর ?

যন্ত্রণাটা দুঃসহ! তপতী মল্লিকের বুকেব ভিতরটাকে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে এই যন্ত্রণা। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। মনে হয়, চোগ ফেটে যেন রক্ত ঝরছে।

একদিন ভাবতেও যে লজ্জা পেত তপতী, বিয়ের আগে নাকি ভালবাসা হয়। সে ভালবাসার মধ্যে যেন একটা সস্তা লোভের নোংরামি আছে বলে মনে হতো। সেই তপতী যে বিয়ের আগেই··· ভালবাসার চেয়েও ভয়ানক অসাবধানতা···সেই কাণ্ডই করে বসে রইল, যেটা পৃথিবীর চোখে ক্ষমাহীন ঘৃণার কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে এত কঠোর শাস্তি দেবার দুঃসাহসই বা পেল কোথা থেকে তপতী মল্লিক ?

না, সন্ধ্যার এই অন্ধকারটার এত হুমকি ভ্রুকুটি আর ধিক্কার সহ্য করা যায় না। ড্রইং রুমে আলো জ্বলছে না; তাই বোধ-হয় সন্ধ্যার অন্ধকারটা এত দুঃসাহসী হয়ে তপতীব অদৃষ্টটাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। বুকের ভিতরের যন্ত্রণার সাপটাকে গলা টিপে একেবারে স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা কঠোর নিঃশ্বাসও যেন তপতীর বুকের ভিতরে ছটফটিয়ে ওঠে।

উঠে দাঁড়ায় তপতী। আলো জ্বালে। না, কিসের এত ভয়? কতগুলি ভীরু আতঙ্কের কালো ছায়া দিয়ে তপতী তার আশার ভালবাসাগুলিকে কালো করে দিতে পারবে না। মিথ্যে আতঙ্ক। শুচিতা অশুচিতার প্রশ্নটাই মিথ্যে। জর্জ ক্রিস্টফার যখন তপতীর জীবনের বান্ধব হয়েই গিয়েছে, তখন আর কতগুলি রীতি-নীতি আর নিয়মের কথা ভেবে ভীরু হয়ে যাবার কোন মানেই হয় না।

কি আশ্চর্য, তপতী নিজেই বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে যায়, আলোটা যেন হাসছে; তপতীর দু'চোখের সব বিষাদের ঘোর কেটে গিয়েছে; হাসছে তপতীর চোখ দুটো। আজকের এই সন্ধ্যাটাকে যে সারা মনের প্রীতি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয়।

কি-যেন সেই গানটা; কাল সকালবেলাতেও রেডিওতে যে গানটা খুব মিষ্টি সুরে বেজেছিল। পানিমে মীন পিয়াসী রে··· বোধহয় সন্ত কবি কবীরের একটি গান। জলেতে থেকেও মাছের প্রাণ পিপাসিত হয়ে থাকবে, এ কোন্ দুর্ভাগ্য? ঠিক কথা। ভালবাসাকে কাছে পেলে শুধু মন দিয়ে কেন, এই শরীর দিয়েই বরণ করে নিতে হয়। তাতে কোন দোষ নেই, কোন ভুল নেই। তৃপ্তির জল কাছে পেয়েও পিয়াসী হয়ে থাকবে কেন জীবনের সাধ?

এতক্ষণের ভয়টার উপর রাগ করতে গিয়ে নিজের উপরেই রাগ করে তপতী। না, আজ তপতীর গায়ের উপর কোন নির্লজ্জতার কাদা ছিটকে পড়েনি। আজ তপতীর দেহটা একটা শ্রদ্ধার স্পর্শকেই বরণ করেছে।

না, কি দরকার স্নান করে? কোন্ অপরাধের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে হবে যে, গায়ের উপর কলের জল ছিটোতে হবে! গ্লানি নয়; তৃপ্তি। সব সন্দেহ সরে গিয়েছে; তাই বিশ্বাস

করতে অসুবিধে নেই, তপতীর প্রাণের ভিতরে আর সারা দেহ জুড়ে যেন তাজা বকুলের সৌরভ আজও বেঁচে আছে। দেখতে পায় তপতী, সন্ধ্যার ভেজা বাতাসে বাগানের মাধবীলতা কী সুন্দর দুলছে!

কলকাতার পিসিমারা আর মাসিমারা নিশ্চয়ই কোন খবর রাখেন না, কল্পনাও করতে পারেন না; আর কল্পনাতে আশা করতেও পারবেন না যে, তপতীর জীবনের আশা সফল হয়েছে। এ বাগানের বকুল শুকিয়ে যায়নি, ঝরেও পড়েনি, সত্যিকারের বসন্তের হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে এতদিনে সত্যি করে ফুটেছে। জানতে পারলে কি আশ্চর্য হয়ে ওঁরা ছুটে আসতেন না? ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটার ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ একটা সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা সহ্য করেন যাঁরা, তাঁরা কি শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না, ভবতোষ মল্লিকের মেয়ের ভবিষ্যৎ এইবার কাছে এসে হাত এগিয়ে দিয়েছে?

হতে পারে, খুব জাঁকাল রকমের একটা নিন্দে রটে গিয়েছে। একটা বিদেশী মানুষের সঙ্গে তপতীর মেলামেশার কাণ্ডটাকে ভবতোষ মল্লিকের মেয়ের একটা ভয়ানক পতনের কাণ্ড বলে মনে করে সবাই হয়তো শিউরে উঠেছেন। কিন্তু যদি জানতেন যে, এ মেলা-মেশা একটা ফ্যাশন মাত্র নয়; ঐ বিদেশী স্কলার মানুষটা যে ভালবাসার জোরে তপতীর জীবনের আপনজন হয়েই গিয়েছে, তবে বোধহয় ওঁরা, মনে হয় বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তপতীর সৌভাগ্যটাকে ওঁরা মনে মনে সহ্য করবেন। আর সুমঙ্গলা হয়তো হিংসে করেই দুটো ঠাট্টার কথা শুনিয়ে দিবে।

টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে কেন? বোধহয় বিকেলের ডাকে এসেছে। কি আশ্চয, এতক্ষণের মধ্যে একবারও চিঠিটা চোখে পড়েনি। না পড়বারই কথা, জর্জ যে এই কিছুক্ষণ

হলো চলে গেল। বিকেল থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত, এর মধ্যে জর্জের মুখের দিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার সুযোগই যে পায়নি তপতী।

চিঠি পড়া শেষ হতেই তপতীর ছ'চোখের ঝকঝকে হাসিটা যেন রাগ করে জ্বলে ওঠে। কী অদ্ভুত সন্দেহের আর ভয়ের কথা লিখেছেন যাদবপুরের পিসিমা। চিঠির ভাষাটা কত কর্কশ! —যা শুনছি, সেটা ভাল নয় ; একটুও ভাল নয় ; কোনমতেই ভাল নয় তপতী।

চিঠিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই তপতী যেন তীব্র একটা ভ্রূকুটি তুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই, বাইরের অন্ধকারটা নিতান্ত নিরেট একটা অবুঝ হিংসুটে অন্ধকার।

ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করেও নয়, তপতীর ঠোঁট ছটো যেন ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরা জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিড়বিড় করে। —সব ভাল, সব দিক দিয়ে ভাল, সব মতেই ভাল।

পর পর ছটো মাস, তারপর আরও কয়েকটা দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে জর্জের কথা আর নিজের কথা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন আলো-ছায়ার কথা তপতী ভাবতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভিতরের বারান্দার একপাশে কাচের জারের ভেতরে অর্কিডগুলি যে মরে যেতে বসেছে, তা'ও চোখে পড়েনি। কলেজে পড়াবার সময় ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে যেন একটা কলের গলা দিয়ে শুধু আউড়ে গিয়েছে তপতী ; কিন্তু মনটা শুধু ভেবেছে, জর্জ কি সত্যিই একদিন দেশে ফিরে যেতে চাইবে ?

হ্যাঁ, শুধু একটা উদ্বেগের কথা কয়েকবার মনে পড়েছিল।

কার্সিয়ং থেকে হরেনকাকাবাবুর চিঠি আজও এল না। তিন মাসের মত হলো, হরেনকাকাবাবুকে চিঠি লিখেছে তপতী; সে চিঠির উত্তর এতদিনে আসা উচিত ছিল।

কিন্তু সে চিঠির উত্তরে কি লিখবেন হরেনকাকাবাবু? প্রশ্নটা তপতীর মনের ভিতরে প্রচণ্ড একটা ভয়ের জিজ্ঞাসা হয়ে বার বার তপতীর চোখের হাসি স্তব্ধ করে দিয়েছে। চিঠিতে যে ভয়ানক একটা মিথ্যে প্রতিজ্ঞার কথা লিখে হরেনকাকাবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে তপতী। তপতী বিয়ে করবে না, একলা হয়ে থাকা জীবনের অহংকার নিয়েই বেঁচে থাকতে পারবে তপতী। হরেন-কাকাবাবু যদি খুশি হয়ে চিঠির উত্তরে এমন কথা লিখেই ফেলেন, শুনে সুখী হলাম তপতী, তবে? তবে আবার সেই ভয়ানক দুঃসাহসের কাগজ-কলম কোথা পাবে তপতী, যার জোরে লিখে ফেলতে পারা যাবে, না কাকাবাবু, একলা হয়ে পড়ে থাকা জীবন নিতান্ত অসহ্য একটা অভিশাপ। আপনি আমার আগের চিঠির প্রতিজ্ঞাটাকে যদি আশীর্বাদ করে থাকেন ভুল করেছেন। আজ বরং এই আশীর্বাদ করুন যে ·।

তপতীর নীরব চিন্তার ভাষাটা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে আর স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন্ মানুষের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে তপতী, কোন্ সাহসে? ভবতোষ মল্লিকের দুই ছেলেকে দুটো পুরো অস্পৃশ্য বলে, আর এক ছেলেকে আধা স্পৃশ্য বলে মনে করেন যিনি, বিদেশী বেজাতের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ করেন যিনি, যটোর আরাবেলা ক্লারা আর সিরিলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে একটুও আগ্রহ নেই যাঁর, সে মানুষ কি তপতীর এই সৌভাগ্যকে আশীর্বাদ করবেন? অসম্ভব! হরেন-কাকাবাবুর কাছ থেকে কোন ক্ষমাও আশা করা যায় না।

না, হরেনকাকাবাবুর কাছ থেকে কোন চিঠি না আসাই ভাল।

হরেনকাকাবাবুকে আর কোন চিঠি না লেখাই ভাল। ঐ মানুষটির স্নেহ আর আশীর্বাদের মহত্ত্বটা যেন বড় সংকীর্ণ একটা ক্ষুদ্রতার সর্ত দিয়ে বাঁধা। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে সবার আগে মানুষটার রক্তের জাতের কথা ভাবে যে মানুষ, তার আশীর্বাদ আর অভিশাপ দুটোই দুই ভুল, দুটো মিথ্যে। না কাকাবাবু, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আপনার ঐ ভয়ানক বিশ্বাসটাকে আমি শ্রদ্ধা করি না। জানি জর্জকে আপনি ঘেন্না না করে পারবেন না; কিন্তু মাপ করবেন, আমার পক্ষে এটা অপমান, বড় দুঃসহ অপমান।

হরেনকাকাবাবুর কথা ভেবে দুটো দিন দুঃখিত হলেও তপতী একদিন নিজের মনের জোরের রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তপতীকে ভয় পাইয়ে দেবার শক্তি আজ আর এই পৃথিবীর কোন আলো-ছায়ার নেই। তপতীর জীবনটাকে আর ভুল করিয়ে দিতে কেউ পারবে না। পিসিমা আর মাসিমাদের, কিংবা সুমঙ্গলা আর অমিতার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, হরেনকাকাবাবুও পারবেন না।

পৃথিবীর কারও তো কোন ক্ষতি করছে না তপতী; কারও জিনিষ কেড়েও নিচ্ছে না; শুধু নিজের সৌভাগ্যটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেউ বাধা দিলে মানবে কেন তপতী? মানবার দরকার কি? কিসের ভয়ে?

আজকাল আর ড্রইং রুমের মধ্যে নয়; উপরতলাব একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিয়েছে তপতী, যে ঘরের ভিতরে একটি সোফা ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। জর্জ যখন আসে, তখন সোজা উপরতলায় উঠে এই ঘরের ভেতরেই এসে বসে। আর তপতীও যদি খোঁপা বাঁধা বাকিও থাকে, তবুও দেরি করে না। এই ঘরের ভেতরে এসে একই সোফার উপর জর্জের সঙ্গে বসে

গল্প করে। খানসামা পাঁচকড়ি এ ঘরের ভিতরে কখনও চা পৌঁছে দিতে আসে না।

বাইরের পৃথিবীটার যত যুক্তি বুদ্ধি আর সমালোচনা, যত ঠাট্টা হিংসে আর আপত্তি, যত ধারণা সংস্কার আর বিশ্বাসের বন্ধন থেকে ছিন্ন করে যেন একটা মুক্তিময় নিরিবিলি তৈরী করে নিয়েছে তপতী; একটা একলা সৌভাগ্যের ঘর; তার মধ্যে শুধু দুজন, তপতী আর জর্জ।

তপতী সেদিন হেসে হেসে তাব সুখী অদৃষ্টেব গর্বটাকে যেন আবৃত্তি করে বলতে থাকে—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলবব।···

জর্জ হাসে—পোয়েট বুঝি একথা বলেছেন?

তপতী—একেবাবে স্পষ্ট কবে বলেছেন।

জর্জ—আশ্চর্য।

তপতী—আশ্চর্য হবার কি আছে?

জর্জ—এটা কি সম্ভব?

তপতী—কেন সম্ভব নয? মানুষ কি পৃথিবীব দশজনেব পছন্দ অপছন্দেব মুখ চেযে ভালবাসে?

জর্জ—না, বাসে না। কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কি?

তপতীব বিবক্ত অথচ আতঙ্কিত মুখটার দিকে তাকিয়ে জর্জ মৃদুভাবে হাসে—তবে দশজনের ব্লেসিং থাকলে ভালবাসাটা একটু বেশি সুখী হয়।

তপতী—হয়তো হয়। কিন্তু সে-জন্যে···।

জর্জ হেসে চেঁচিয়ে ওঠে। —সে-জন্যে আমি বলবো না যে, তুমি আমাকে না ভালবাসলেই ভাল করতে। যখন জানি শুরু হয়েই গিয়েছে, তখন থামবার দরকার কি, আর ভাবনা করেই বা লাভ কি?

তপতী—ভাবনা করবার কোন কারণও নেই। মানুষ তার নিজেরই মনগড়া যত ভয়গুলিকে কারণ বলে মনে করে।

জর্জ—অনেক সময় করে। কিন্তু···

তপতী—আবার কিন্তু কিসের?

জর্জ আবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —কি করবে বল? সব মানুষ তো আর ওমর খৈয়াম নয়। সকলেরই সেই সাহস নেই যে বলতে পারে—এস সাকী, কিস্‌মতের চক্রান্ত ছিন্ন করে পালিয়ে গিয়ে, দুইজনে মিলে গোলাপবাগের এক নিভৃতের ছায়ার আড়ালে নতুন স্বর্গ গড়ে তুলি।

তপতীও হাসে—কিন্তু আমি আর তুমি যে পারি, সেটা···।

জর্জ—সেটা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তা না হলে, কোথায় আমার দেশ আর কোথায় এই সার্কাস অ্যাভিনিউ। জীবনটা যেন সবছাড়া হয়ে তোমার কাছে এসে পড়েছে।

তপতী হাসে—পোয়েট একটা কথা বলেছেন, সেটা প্রায় তোমার জীবনের সঙ্গে মিলে যায়।

—কি?

—এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে!

—মোটেই না। তুমি ভুল বুঝেছ তপতী। এদেশের সবই আমার ভাল লেগেছে, এটাও সত্য নয়। এদেশকে আমার দেশের চেয়ে বেশি লাগে, এটাও সত্য নয়। হ্যাঁ, খুব সত্যকথা এই যে, তোমাকে ভাল লেগেছে। আমার সৌভাগ্য, তোমার যত ভুল ধারণা আর ভুল কথাগুলিকেও আমার ভাল লাগে।

—তবে এত তর্ক আর আপত্তি কর কেন?

—সেটা করবো। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তোমাকেই ভুল বলে মনে করছি।

—কিছুই বুঝলাম না জর্জ।

—ধর না, তুমি যে খাবার খাও সেটা দেখলে আমার ভয় করে।

—কেন?

—এত ভেজিটেবল মানুষও খেতে পারে, ছিঃ। সেদিন তোমার খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা বোটানিকাল গার্ডেনকে সেদ্ধ করে ডিসের উপর সাজিয়ে নিয়ে খেতে বসেছ। এত হাবিজাবি মানুষে খায় কি করে?

তপতী—তুমি কি রকম খাওয়া পছন্দ কর?

জর্জ—আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো বীফ স্টিক আর পোর্ক সসেজ।

তপতী—তার মানে একটা স্লটার হাউসকে সেদ্ধ করে আর ডিসের উপর সাজিয়ে নিয়ে...।

জর্জ—ঠিক কথা। এ বিষয়ে তোমাব আমার মধ্যে কোন মিল নেই।

তপতী—কোথায় যে ছাই কী মিল আছে তাও তো জানিনা। সংস্কৃত ভাষার কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, অথচ তোমাকে দেখছি...।

জর্জ—ঠিক কথা। আমি সংস্কৃত ভাষা ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালবাসি তপতীকে, তাই...।

তপতী—কি?

জর্জ—তাই আজ তোমাকে কথা দিতে পাবি, আমার আর দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না, যদি তুমি সঙ্গে না যাও।

তপতীর দু'চোখের দৃষ্টি যেন এক বিপুল সান্ত্বনার স্নেহে সিক্ত হয়ে ছলছলিয়ে ওঠে। —তোমার কাছে থেকে আমি এই কথাটুকু শোনবার জন্য যে স্বপ্নের মধ্যেও ছটফট করেছি জর্জ। বড় ভয় ছিল জর্জ...।

—কিসের ভয়?

—তুমি এদেশকে ভালবাসতে না পেরে শেষে আমাকেই…।

—যে-কথা বলছি, সে-কথা আবার বলছি তপতী। এদেশকে আমি বিশ্বাস করি না, তেমন ভালও বাসি না, আমি ম্যাক্সমুলারের মত অন্ধ ইণ্ডোফিল নই। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি। এবং সে ভালবাসার জন্য এটুকু কষ্ট স্বীকার করতে রাজি আছি যে, নিজের দেশে আর ফিরে যাব না, যদিও আমার মনে আমার দেশ চিরকালই ভালবাসার দেশ হয়ে থাকবে।

তপতীর মুখটা করুণ হয়ে যায়।— এদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতে পারছো না কেন জর্জ? তোমার দেশ যেমন ভাল-মন্দ দিয়ে গড়া, এদেশও তেমনি। তবে তুমি কেন…প্রায় আমার হরেন কাকাবাবুর মত একটা মিথ্যে সংস্কার দিয়ে…।

জর্জ—আমি জানি না, তিনি সাদা জাতিকে এত অবিশ্বাস করেন কেন? কিন্তু আমি…আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, এদেশকে আমিও কেন ঠিক বিশ্বাস কবতে পারছি না। এদেশকে আপন দেশ বলে মেনে নেবার মত তেমন যুক্তি আজও পাইনি।

তপতী—যাক্, তাতে আমার অবশ্য কিছু আসে যায় না।

জর্জ—আমার কিন্তু আসে যায়।

তপতী—কেন?

জর্জ—এদেশকে ভাল লাগবে না, অথচ এদেশেই একটা চাকরি নিয়ে প'ড়ে থাকতে হবে। এটা আমার পক্ষে কম শাস্তি নয় তপতী।

তপতী—চাকরি পেযেছ?

জর্জ—পেয়েছি। তোমাদের কালচারাল মিনিস্ট্রির এক পেটোয়া সোসাইটি কয়েকটা সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক বই ইংরেজীতে অনুবাদ করবার কাজ দিয়েছেন। তোমাদের দেশের চমৎকার কতকগুলি পুরনো অপমানের অনুবাদ করবার কাজ।

—কিরকম?

—যেমন, একটি বই হলো, গজনীর মামুদের প্রশস্তির বই।

—সেই ভয়ানক হিংস্র ইনভেডার, যেটা সোমনাথের মন্দির বার বার ভেঙ্গেছিল ?

—ইয়েস তপতী, তারই নামে জয়গান গাওয়া একটা বই আছে, এক হিন্দু পণ্ডিত-কবিই লিখেছিলেন, উদয়রাজের লেখা রাজবিনোদ।

—ছিঃ ; যেন হঠাৎ ঘেন্না পেয়ে শিউরে ওঠে তপতী।

জর্জ হাসে—কার ওপর রাগ করছো তপতী ?

তপতী—এমন বই লিখতে পেরেছিল যে পণ্ডিত, তার কোন মনুষ্যত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। নিজের দেশের এক সর্বনেশে শত্রুর প্রশস্তি গাইতে…।

জর্জ—যাক্, আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় তোমাদের গভর্ণমেণ্টের পেটোয়া সোসাইটিটার উপব রাগ করছো।

তপতী—কি বললে ?

জর্জ—সোসাইটির মনুষ্যত্বে বোধহয় কোন ভুল নেই ? ইংরেজীতে অনুবাদ করবার মত এত বই সংস্কৃত-সাহিত্যে থাকতে, তারা দেশের ইতিহাসের অপমানকারী একটা ইনভেডারের প্রশস্তিকে অনুবাদ কববার জন্য বেছে নিয়েছে, এটা বেশ ভাল মনুষ্যত্বের প্রমাণ, কেমন ?

তপতী চমকে ওঠে।—বুঝেছি, তুমি ঠাট্টা করছো জর্জ। এই সোসাইটিকে ঘেন্না কবে বলা যায়…।

জর্জ হাসে—যাক্, আর কিছু বলে দরকার নেই। ওতে কোন লাভ হবে না। তাতে আমার ধারণা বদলাবে না।

তপতী—তোমার কোন্ ধারণা ?

জর্জ—যদি আবার রাগ না কর, তবে বলতে পারি।

তপতী—বল। রাগ করবো না।

জর্জ—আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি, একটু লজ্জাও পেয়েছি তপতী, তোমার দেশ নিজেই নিজেকে অপমান করতে বড় ভালবাসে।

তপতী গম্ভীর হয়। —যখন কথা দিয়েছি, তখন রাগ করবো না, তর্কও করবো না।

জর্জ হাসতে চেষ্টা করে।—শুনে সুখী হলাম, যদিও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

তপতী—কেন ?

—বোধহয় আমার মনে একটা সন্দেহ আছে।

—সন্দেহ ?

—হ্যাঁ। মনে হয়, তোমার দেশকে আমি মনে-প্রাণে ভালবাসতে পারছি না বলে তুমিও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে পারবে না।

—এমন সন্দেহ করবার মত কোন কারণ দেখতে পেয়েছ ?

—এখনও দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু বুঝতে পারছি না, কেন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

—ছিঃ, জর্জ। তুমি ভয়ানক ভুল করছো।

—হতে পারে, তোমাকে শ্রদ্ধা করতে যদি আমার মনে কোন কুণ্ঠা গোপন হয়ে থাকে, তবে সেটা ভুল করাই হবে ; ভয়ানক ভুল।

কথাগুলি মৃদুস্বরে বলতে গিয়েও জর্জের সারা মুখের ছবিটা যেন আহত মানুষের মুখের মত একটা অস্বস্তির জ্বালা চাপতে গিয়ে লালচে হয়ে ওঠে। যেন জর্জের কল্পনার আনন্দটা একটু ভয় পেয়েছে। কিংবা জীবনের একটা প্রিয় বিশ্বাসের গায়ে তীক্ষ্ণ এক অপমানের কাঁটার খোঁচা লেগেছে।

তপতীর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ একটা শংকার ছায়া ছটফট করে—আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে না, এই কি তোমার সন্দহ ?

জর্জের চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ের আবেশে মুগ্ধ হয়ে থমথম করে।— কি বললে তপতী? বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—কবে বিয়ে?

—তুমি যেদিন বলবে?

তপতীর একটা হাত বুকের কাছে টেনে নেয় জর্জ। —তোমাকে কি-কথা বলে যে আদর কববো, ভেবে পাচ্ছি না তপতী। এই কথাটি তোমার মুখে কোনদিন শুনতে পাইনি বলেই আমাব ভুল হয়েছিল তপতী।

—বুঝলাম না।

—সন্দেহ করতে হযেছিল, তপতী বোধহয তার জীবনেব সাথী হবাব অধিকাব দিযে আমাকে সুখী করতে চায় না। শুধু একটা স্পোর্টেব আনন্দ দিযে আমাকে দুদিনেব জন্য খুশি কবে দিতে চায?

—কী অদ্ভুত সন্দেহ।

—না, আমার সন্দেহেব জন্য এখন আমি লজ্জিত। আমাকে মাপ কর তপতী।

তপতীর দু'চোখের দৃষ্টিতে তবু একটা অভিমান যেন নিবিড হয়ে ঘনিযে থাকে।—আমাব ভালবাসাকেও তুমি ভয করতে শুরু কবেছিলে, আমার দুর্ভাগ্য।

জর্জ—আমাবই দুর্ভাগ্য। তোমাকে শ্রদ্ধা কবতে বাধা ছিল। কিন্তু থাক্ এসব কথা। আমি আজ সম্মানিত, আশ্বস্ত, নিশ্চিন্ত। তোমার ভালবাসার সাহসকে ধন্যবাদ।

তপতীর মুখটাও যেন বিপুল এক আশ্বাসের স্নিগ্ধতায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

চলে যাবার আগে তপতীর খোঁপা থেকে দুটো ফুল তুলে নিয়ে

জর্জ বলে—তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পার তপতী, খেলার ছলে ভালবাসা আর ভালবাসার ছলে খেলা করা, দুইই দুটো সমান ভুল।

তপতী হাসে—নিশ্চয় স্বীকার করি।

—বিশ্বাসও কর নিশ্চয় ?

—নিশ্চয়।

—কবে থেকে ?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে, যখন তুমি বললে যে, তুমি এদেশেই থাকবে।

—তাতে কি প্রমাণিত হলো ?

—ঐ যে, যা বললে; প্রমাণিত হলো যে তুমি ভালবাসার ছলে খেলা কবছো না।

তপতীকে বুকে জডিযে ধরে কৃতার্থভাবে হাসতে থাকে জর্জ।

—তোমাবও মনে সন্দেহ ছিল ?

তপতী—ছিল বোধহয।

জর্জ চলে যাবাব পবেও তপতীর মনেব ভিতবে যেন বিচিত্র এক প্রতিধ্বনিব মূর্চ্ছনা ভেসে বেডাতে থাকে। না, সন্দেহ নেই। প্রতিধ্বনিটা যেন তপতীর ভালবাসাব বিজয সঙ্গীত।

তপতীর ভালবাসাব সাহসকে ধন্যবাদ জানিযেছে জর্জ। এই সাহসটাও যে তপতীব ইচ্ছাব জযপতাকা। কোন ক্ষতি নেই, কেউ যদি এই বিযেকে আশীর্বাদ না করে। জর্জ ক্রিস্টফার আর তপতী মল্লিক, স্বামী আর স্ত্রীর একটি নিরিবিলি ভালবাসার ঘরটা যদি একগাদা আশীর্বাদী চেঁচামেচির অভাবে একঘরে হয়ে যায়, তাতেই বা কি আসে যায় ?

কিন্তু···নিরালা ঘরে সোফার উপরে পড়ে থাকা তপতীর শরীরটা যেন ধড়ফড় করে নড়ে ওঠে। কি আশ্চয, সত্যিই যে সোফার কাঁধের

উপর মাথাটা কতক্ষণ ধরে এভাবে এলিয়ে পড়ে আছে, কে জানে? চোখ দুটোই বা বন্ধ হয়ে এত স্যাঁতসেতে হয়ে গেল কখন? ইস্, কতকাল আগের কত কথা আর কত ছবি এই সামান্য কিছুক্ষণের ঘুমন্ত প্রাণটার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করে চলে গেল!

কথা নয়, যেন কতগুলি ঠাট্টার কোরাস। ছবি নয়, যেন একগাদা ভ্রুকুটি। নিদারুণ একটা ভুলের ইতিহাস ধিক্কার দিয়ে ছুটোছুটি করেছে। তোমার সারা জীবনের ইচ্ছা চেষ্টা বিশ্বাস আর ধারণা, সব হেরে গিয়েছে। তুমি একটি আস্ত পবাজয়। তোমার সব হিসেব মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। জর্জ ক্রিস্টফারকে ভালবেসেছ, এটা তোমার জীবনের সেই নিদারুণ হিসাব আর সাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত। ভালবাসার নিজেরই একটা নিয়ম আছে, তোমার ইচ্ছাব শাসনে ভালবাসা চলে না।

দু'হাত দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে জোবে একটা হাঁফ ছাড়ে তপতী। না, আর কিছু বলবার নেই। অস্বীকাব কববারই বা যুক্তি কোথায়? মানুষেব ইতিহাসেও যে একটা ঠাট্টার গল্প এখনও হাসছে; সিরাকিউজের সেই টায়রেণ্ট বাজা ডায়োনিসিযাস চেয়েছিল, ববফের উপব ফুল ফুটুক্। কিন্তু বরফের উপব ফুল ফোটেনি। রাজ্যেব সব মালী ভয় পেয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে, কোন বাগানের মাটিতেও ফুল ফোটেনি।

ছিঃ, যেন নিজেরই অতীতের ইতিহাসটাকে ছোট্ট একটা ঠাট্টার শব্দ দিয়ে ধিক্কৃত করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় তপতী। কে জানে কোন্ অহংকাবেব ভুলে তপতীর অতীতের জীবনটা, ঐ টায়রেণ্টেব মত মানুষের সংসারের উপর তার ইচ্ছাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল।

পাশের ঘরের দেয়াল ঘড়ির বুকে সময়ের সংকেত মিষ্টি শব্দ করে বাজছে। কলেজ যাবার সময় হয়েছে।

ব্যস্ত হতে গিয়ে তপতীর চোখে-মুখে যেন একটা নিরুদ্বেগ তৃপ্তির হাসি এক ঝলক ভোরের আলোর মত চমকে ওঠে। তপতী যেদিন বলবে, সেদিনই বিয়ে হয়ে যাবে। তপতীর হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই যেন একটা লগ্নের সংকেত মিষ্টি শব্দ করে বাজতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ভাবতে গিয়ে প্রাণটাও যেন একটু লজ্জিত হয়ে হেসে ওঠে, ভালই হয়েছে। অতীতের সেই সব ভুলের কাঁটা ধন্য করে তপতীর আশা যে আজ সত্যিই গোলাপ হয়ে ফুটেছে। ভুল করেই এতদিনের অপেক্ষার যাতনা সহ্য করেছিল বলেই যে জর্জকে আজ নিজের জীবনের ঘরে দেখতে পেয়েছে তপতী।

নীরুদির বাড়িতে আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা তপতীর জীবনের মান-সম্মানের কথাটা ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এসেছেন যাদবপুরের পিসিমা। অমিতা আর সুমঙ্গলাও এসেছে। আলিপুরের ছোটমাসি এসেছেন। তা ছাড়া আরও একজন এসেছেন, যাঁর আসবার কথা ছিল না, এবং তিনি তপতীর কোন আত্মীয়-সম্পর্কের মানুষ নন, বান্ধবী অমিতা ও সুমঙ্গলার মত তপতীর কোন পরিচিত-জনও নন। তিনি হলেন সুধাময়বাবু।

বাপ নেই মা নেই, ভাইগুলি সব বিদেশে পড়ে আছে, মেয়েটার এরকম একটা একলা আর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোথাকার একটা ইংরেজ ছোকরা বিশ্রী একটা সমস্যা ঘটিয়ে তুলেছে, যাদবপুরের পিসিমা আর আলিপুরের ছোটমাসি এই কথাই ভাবছেন। কিন্তু উপায় কি? সে-কথাও ভাবছেন। ভয় হয়, তপতী ওর এরকম বয়সের জীবনেও একটা আরও বিশ্রী রকমের ভুল করে ফেলতে পারে। শুধু নিজের জীবনের সম্মান নয়; ভবতোষ মল্লিকের বংশের সম্মান ভুল করে ডুবিয়ে দিতে পারে তপতী; যদি এখনই ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সাবধান না করে দেওয়া যায়।

সুধাময়বাবু বললেন—আমি কিন্তু তপতী মল্লিকের মান-সম্মানের কথাটা বড় করে ভাবছি না।

অমিতা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—তবে কার সম্মানের কথা ভাবছেন ?

সুধাময়—আমি ভাবছি বাঙালীর মান-সম্মানের কথা। জর্জ ক্রিস্টফারকে আমি কিছুটা চিনি। একটি বার্ড অব প্যাসেজ বলে মনে হয়। ফুর্তির আবেগে উড়ে এসেছে, তুদিনের জন্য এখানে-সেখানে নেচে গেয়ে বেড়াবে; আর এরই মধ্যে কোন না কোন বাগানের ফল ঠুকরে দিয়ে সরে পড়বে।

অমিতা—কিন্তু উনি তো বলছিলেন, ব্যাপারটা তা নয়।

সুধাময়বাবু—উনি কে ?

নীরুদি বলেন—অমিতার স্বামী বিলাস, আর্কিয়লজির সার্ভেতে কাজ করে।

অমিতা—জর্জ ক্রিস্টফাবের সঙ্গে ওঁর আলাপ-পবিচয় হয়েছে। জর্জ ক্রিস্টফার নিজেব মুখেই ওঁকে একথা বলেছে, সে এদেশেই থাকবে আর এদেশেই এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করবে।

সুধাময়বাবু মৃত্নভাবে হাসেন—একথা থেকে কি এমন কিছু প্রমাণিত হয় যে, আমার ধারণাটা মিথ্যে ?

অমিতা—যদি এদেশেই থাকবে, আর তপতীকে বিয়ে করবে, তবে আর···।

সুধাময়—আহা! সেটাই কি এক হিসাবে বাঙালীর অপমান নয় ?

অমিতা—ভগবান জানেন, আপনি কি বলতে চাইছেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নীরুদি বলেন—আমি শুধু তপতীর বয়সটার কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছি। নিজের চেয়ে কম বয়সের একটা মানুষকে··, ভাবতে

বিশ্রী লাগে, তপতীর মত শক্ত সাবধানী মেয়ের মনও এরকম হ্যাংলা হয়ে গেল কেন ?

সুমঙ্গলা বলে—এখন শুধু আমাদের চেষ্টা করা দরকার, বিয়েটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তবেই সম্মান বাঁচবে।

সুধাময়বাবু যেন একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূভঙ্গী করেন—কিন্তু সব চেয়ে ভাল হয় কিনা, যদি বিয়েটাই না হয় ?

সুমঙ্গলা—না।

সুধাময়—কেন ?

সুমঙ্গলা—আমি জানি, বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

যাদবপুরের পিসিমা বলেন—ভাল হয়, সাহেব ছেলেটা যদি হিন্দু হয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

আলিপুরের ছোটমাসি বলেন—বিয়েটা হিন্দুমতে হলে আরও ভাল হয়।

সুধাময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি আশ্চর্য, আপনারা সবাই দেখছি বিয়ে দেবার কথাটাই চিন্তা করছেন। কিন্তু এমন বিয়ের অর্থটা কি ?

অমিতা—আপনিই বলুন, কি অর্থ ?

সুধাময়বাবু—আমি তো দু'বার বললাম। এটা আমাদের সমাজের অপমান, জাতির আর দেশের অপমান।

অমিতা আর সুমঙ্গলা বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সুধাময়বাবু তবু চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—আপনারা সবাই তপতী মল্লিকের আত্মীয় আর পরিচিত। তপতীর জন্য আপনারা স্বার্থবাদীর মত কথা বলবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি শুধু জাতির সম্মানের কথাটা ভাবছি। যেন এদেশে কোন মানুষ ছিল না, যে-জন্যে তপতী মল্লিক আজ এক ইংরেজ ছোকরাকে বিয়ে করবে।

অমিতা ফিরে এসে বলে—আপনার ভাই-পো সমরেশ কেন

আইরিশ মেয়েটাকে বিয়ে করলো? এদেশে মেয়ে ছিল না? তাতে বাঙালী জাতের অপমান হয়নি?

সুধাময়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন।—আপনি খবরটা জানেন দেখছি। কিন্তু···সত্যি কথা···আমি ঠিক আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবো না,···বাঙালী জাতের মান-সম্মানের প্রশ্নও বোধহয় নয়···ওটা আমার একটা কথার কথা···আসল কথা হলো, আমি কিছুতেই কাণ্ডটা সহ্য করতে পারছি না।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন সুধাময়বাবু। তারপরেই উঠে দাঁড়ান।—আচ্ছা নমস্কার, আমি চলি। আপনাদের একটা পারিবারিক ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কিছু বলতে আসাই ভুল হয়েছে।

সুধাময়বাবু চলে যাবার পর ঘরের ভিতরে যাঁরা রইলেন, তাঁরা সবাই মহিলা। এই মহিলা-সমাবেশের মধ্যে ঘরের বা বাইরের কোন ভদ্রলোক নেই, কাজেই আলোচনারও এইবার মনখোলা আর মুখখোলা হয়ে উঠতে কোন বাধা নেই। হয়েও ওঠে।

নীরুদি বলেন—তুমি এত জোর দিয়ে কথাটা কেন বলছো, সুমঙ্গলা?

সুমঙ্গলা—কি কথা?

নীরুদি—তপতীর সঙ্গে সাহেবটার বিয়ে না হলে খুবই খারাপ হবে, কথাটার মানে কি?

সুমঙ্গলা—নিজের চোখ দুটোকে অবিশ্বাস করতে পারি না, তাই বলেছি।

যাদবপুরের পিসিমা চমকে ওঠেন—কি দেখেছো?

সুমঙ্গলা—দেখেছি, তপতীর জীবনে আর কোন লজ্জা-ভয়ের বালাই নেই। বিয়ের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার মত সামান্য সভ্য-ভব্য ধৈর্যটুকুও চুলোয় দিয়েছে তপতী।

—সর্বনাশ। আর্তনাদ করে ওঠেন যাদবপুরের পিসিমা।

—ছিঃ, চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেন আলিপুরের ছোটমাসি।

অমিতা হতভম্বের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে—তপতীর মাথাটা কি খারাপ হয়েই গেছে?

নীরুদির গলার স্বর এবার বেশ তপ্ত হয়ে ওঠে।—বড় বেশি বেপরোয়া আর বেহায়া হয়ে গিয়েছে তপতী।

আলিপুরের ছোটমাসি—এ বয়সে এভাবে নিজেকে নষ্ট করতে পারে, ভাবতেও যে আমার আশ্চর্য লাগছে।

নীরুদি—বেশ তো, সাহেব ছোকরার সঙ্গে চেনা-শোনা আর ভাব-সাব যদিই বা হলো, আমাদের পাঁচজনকে বলে একটা পরামর্শ তো নিতে পারতো। তপতী আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না বোধহয়।

সুমঙ্গলা—আমার শুধু ভয়, যদি বিয়েটা না হয়।

নীরুদি—এমন বিয়ে হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি?

অমিতা—ভগবান করেন, সাহেবটা যেন ঠগ না হয়।

নীরুদি—ধরে নিলাম, সাহেবটা ঠগ নয়। ধরে নিলাম, বিয়েটা হবেই। কিন্তু ও ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করবার আছে?

সুমঙ্গলা—আমাদের আবার কি করবার আছে? কিছুই না।

নীরুদি—সে কথাই বলছি। তপতী যখন বেপরোয়া হয়ে আমাদের সবাইকে তুচ্ছ করে, আর একটা যাচ্ছেতাইপনা করে সুখের ঘর বাঁধতে চাইছে, বাধুক। আমি আপত্তি করবো কেন? কিন্তু আমি যাব না।

সুমঙ্গলা হাসে—কোথায় যাবেন না?

নীরুদি—ওদের বিয়েতে।

সুমঙ্গলা—তপতী আপনাকে যেতে বলবে, এটাই বা মনে করছেন কেন?

নীরুদি—মনে করছি না। যদি যেতে বলে, তবুও যাব না।

আলিপুরের ছোটমাসি—আমিও যাব না।

সুমঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাও বলে—আমরাও যাব না। কিন্তু··।

নীরুদি—কি ?

অমিতা—কিন্তু সত্যিই বুঝতে পারছি না নীরুদি, কেন ওদের বিয়েতে যেতে ইচ্ছে করছে না।

নীরুদি—বুঝতে অসুবিধের কিছু নেই। মানুষের জীবনের সব নিয়ম-কানুন চিরটা কাল তুচ্ছ করে তপতী শেষে বিয়েটাকেও একটা জুলুমের মত কাণ্ড করে তুললো; এতটা সহ্য করা উচিত নয় অমিতা। বয়স মানলে না, জাত মানলে না, সমাজ মানলে না, দেশ মানলে না, সাধারণ একটা মেয়েলী সাবধানতাকে মানলে না। কারও কোন উপদেশের পরামর্শের বা সাহায্যের ধারও ধারলো না। মেনে নিলাম, এসব করেও শেষ পর্যন্ত ওর একটা ভাল হয়েই যাবে। কিন্তু সেটা আমরা সবাই ভাল বলে মেনে নিতে পারি না।

আলিপুরের ছোটমাসি বলেন—ভুল করেও যদি কেউ বেঁচে যায়, তাতে ভুলটা মিথ্যে হয়ে যায় না, আর, মেনে নেওয়াও যায় না।

যাদবপুরের পিসিমা—আমরা যদি এ বিয়েতে যাই, তবে শুধু তপতী নয়, আর দশটা মেয়ের মনেও ধারণা হতে পারে তপতীর কাণ্ডটা আমরা সমর্থন করছি, ওতে দোষের কিছু নেই।

নীরুদি—ঠিক বলেছেন। ধরুন যদি, আর পাঁচটা মেয়ে তপতীর পথ ধরে, তবে ওদের মধ্যে অন্তত তিন-চারটের জীবন কি নষ্ট হয়ে যাবে না ?

সুমঙ্গলা—শোনেন নি ? অপরাজিতার কি দশা হয়েছে ?

নীরুদি—কি হয়েছে ?

সুমঙ্গলা—সিমলাতে থাকতে ভালবেসে এক ইটালীয়ান মার্চেন্টকে বিয়ে করেছিল অপরাজিতা। একদিন পুলিশ এসে মার্চেন্ট ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে। জানা গেল, ভদ্রলোক সত্যি মার্চেন্ট নন, সোনার স্মাগ্‌লার।

নীরুদি—ভগবান করুন, তপতীর যেন এরকম দুর্ভাগ্য না হয়।

অনেকদিন আগে জর্জ দেশে ফিরে যাবে শুনে সেই যে একবার ভয় পেয়ে আর নিঃশ্বাসের একটা অভিমানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, চোখের জল ফেলেছিল তপতী, তারপর আর কোনদিন নয়, অনেক কথা ভেবে চোখ ভিজেছে ঠিকই, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়। আজ কিন্তু খুবই ভয় পেয়ে, আর এত বড় বাড়ির সব চেয়ে ছোট ঘরটার এক কোণে নিরেট অন্ধকারের মধ্যে একটা সোফার উপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, নিজের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই, তবু বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আহত লজ্জার কান্না তপতীর চোখ দুটোকে কাঁদিয়ে আকুল করে তুলেছে। এ কি হলো? এত সাবধান তপতী মল্লিকের প্রাণটা এত অসাবধান হয়ে গেল কেমন করে? জর্জের হাত ধরতে লজ্জা করবার কোন দরকার ছিল না; কিন্তু এখনও যে বিয়েটা হয়ে যায় নি; এখনও যে জর্জকে তপতীর স্বামী বলে কেউ মনে করে না, স্বীকারও করেনা। এতদিন ধরে এত সাবধানে রাখা এই শরীরের ভিতরে কোথায় লুকিয়েছিল এত লোভ, এত দুঃসাহস? জোর করে জর্জের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেনি কেন তপতী?

ডাক্তার মৃণালিনী যে এমন একটা কথা সত্যিই বলে দেবেন, ভাবতেই পারেনি তপতী। মনে হয়েছিল, না, সে-সব কিছু নয়। শরীরটা এমনি শুধু একটু খারাপ হয়েছে। কিন্তু তপতীর হৃৎপিণ্ডের

গভীরে গোপন করা একটা সত্যকে যেন এক মিনিটেই আবিষ্কার করে ফেললেন ডাক্তার মৃণালিনী। —আর মাস দুই পরে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নেবেন। আর, একটু সাবধানে থাকবেন।

—তপতী, তুমি কোথায়? ঘরের কোনে বসে, সেই কান্নারই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে আজই শুনতে পেয়েছে তপতী, তপতীর নাম ধরে জর্জ ডাকছে। তপতীকে দেখতে না পেয়ে যেন ভালবাসার একটা প্রাণ উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকছে।

শেষে তপতীর সেই কান্নার চোখই হেসে উঠেছে। তপতীকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আর যেন দুর্জয় একটা প্রতিজ্ঞার মূর্তি হয়ে জর্জ শুধু কয়েকটা কথা বলেছে—আমি থাকতে তোমার কিসের লজ্জা, কিসের ভয় আর কিসের অপমান? থ্যাংক গড, আমার ছেলে তোমার কাছে এসে গিয়েছে।

তপতী বিহ্বল হয়ে বলে—এবার তবে বিয়ের দিনটা…।

জর্জ—ঠিক করে ফেল। আমি তো আগেই বলেছি, যেদিন তোমার সুবিধে, যেদিন তোমার ইচ্ছে, সেদিনই বিয়েটা হয়ে যাক্।

তারপর, আজকের সারাদিনের কোন মুহূর্তেও তপতী মল্লিকের প্রাণের কাছে কোন বিষণ্ণতার ছায়াও ঘেঁষতে পারেনি। সেই চরম অসাবধানতা, যেটাকে হঠাৎ ভুলের একটা ভয়ানক অপরাধ বলে মনে করে কেঁদে ফেলতে হয়েছিল, সেটাও যে জীবনের একটা পরম কৃতার্থতার মত গর্বের হাসি হেসে তপতী মল্লিকের মুখের হাসিটাকে গর্বিত করে রেখেছে।

তপতীর ইচ্ছার আনন্দকে ভয় পাইয়ে দেবার মত কোন ভ্রূকুটি আর পৃথিবীতে নেই। শুধু একটা দুঃখ এই আনন্দেব বুকে যেন ছোট্ট একটা কাঁটার মত বিঁধছে। হরেনকাকাবাবুকে চিঠি লেখা আর সম্ভব হলো না। কেন যেন মনে হয়, হরেনকাকাবাবু এই বিয়ের কথা শুনে একটুও খুশি হবেন না।

ভয়টা ঠিক হরেনকাকাবাবুকে নয়, হরেনকাকাবাবুর মনের একটা ভয়ানক সংস্কারকেই ভয়। গ্লাসগো বার্লিন আর মিশিগান কাউকেই ক্ষমা করতে পারেননি হরেনকাকা, এমন-কি লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্স'ও যাঁর চোখের বিষ হয়ে উঠেছে, ক্লারা আর জুলিয়ানদের ফটোর অ্যালবামটাকে ঘেন্না করে হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেন যিনি, তিনি কি তপতীর এই বিয়েকে ক্ষমা করতে পারবেন? যাক্, যিনি আশীর্বাদ করতে পারবেন না, যেচে তাঁর কাছ থেকে অভিশাপ কুড়োবার দরকার কি? হরেনকাকাবাবুকে চিঠি না দেওয়াই ভাল।

আর দশদিন পরে, এই সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের এক সার গুলমোরের মাথার উপর আকাশের চাঁদের সুধা গলে গলে ঝরে পড়বে। আর সাতদিন পরে পূর্ণিমা। তার মানে বিয়ের দিনের শুভসন্ধ্যায় প্রথম আঁধার একটু ঘনিয়ে উঠেই হেসে উঠবে। কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদটা তো আর একফালি রোগা চাঁদ নয়। গেটের মাথায় বুগেনভিলিয়ার ঝাড়ও সেই ঢালা জ্যোৎস্নায় স্নান করে ঝলমল করবে।

তপতী মল্লিকের দু'চোখের দৃষ্টিতেও যেন জ্যোৎস্না ঝরছে। সারা জীবনের অপেক্ষার অদৃষ্টটা যে এমন একটা পরিতৃপ্তির জ্যোৎস্নাময় লগ্ন পেয়ে যাবে, এ যে তপতীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। চিঠি লিখতে শুরু করে তপতী।

প্রথম চিঠিটা জর্জ ক্রিস্টফারকেই লিখতে হলো। এলিয়ট রোডে মিসেস পার্কারের ঘরোয়া হোটেলের ছোট একটি ঘর আর একটি বারান্দা, আর তিন শেল্‌ফ বই, জর্জ ক্রিস্টফারের প্রবাস জীবনের এই সামান্য সংসারটাও তপতীর এই চিঠি পেয়ে বোধহয় জ্যোৎস্নাময় হাসিতে ভরে যাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই সেদিনও জর্জের চোখে যেন অদ্ভুত

একটা ভীরুতার ছায়া দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সে ছায়াটা যেন একটা সন্দেহ; বিয়ের দিনটা স্থির করতে দেরি হচ্ছে বলে জর্জের মনটা যেন তপতীর ইচ্ছার প্রাণটাকেই সন্দেহ করেছে। এখনও যদি জর্জের মনে কোন ছায়া থেকে থাকে, তবে এই চিঠিই সে ছায়ার সব অন্ধকার আজ ঘুচিয়ে দেবে। মনে মনে বোধহয় একটু লজ্জিতও হবে জর্জ।

জর্জের কাছে চিঠি লেখা শেষ করতে গিয়ে যেন একটু হাঁপিয়ে পড়ে তপতী। বুকটা ধড়ফড় করছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস যেন নিজেরই দুঃসাহসে ভয় পেয়ে মন্থর হয়ে গিয়েছে। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মোছে তপতী।

কিছুদিন আগেও একবার, তপতী মল্লিকের এই উৎসবমুখী প্রাণের সব নিঃশ্বাসের বাতাস হঠাৎ মন্থব হয়ে গিয়েছিল। দুঃসাহসের ভয়ে নয়, দুঃসাহসের লজ্জায়। সত্যিই যে তপতীর ইচ্ছাটা সেদিন যেন মনের ভিতরে কথা বলে উঠেছিল, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না! বিয়ে না হলেই বা কি আসে যায়? জর্জ আর তপতী, দুটি ভালবাসার প্রাণ যদি বিনা রাখীর বন্ধনে চিরকালের দুটি বান্ধব হয়ে থেকে যেতে পারে, তবে ক্ষতি কি? আর, এর মধ্যে আক্ষেপেরই বা কি আছে। ঠিকই তো, মিথ্যে সন্দেহ করেনি জর্জ।

কিন্তু, সেদিনের এই কল্পনার ভাষাটাকে একটা প্রলাপ বলে মনে করতেও দেরি হয়নি। সেই মুহূর্তে, বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ উথলে ওঠা একটা লজ্জিত বেদনা তপতী মল্লিকের চোখ দুটোকেও চমকে দিয়েছিল।

আর, বেশিক্ষণ দেরিও করেনি তপতী। টেলিফোনে ডাক্তার মৃণালিনীকে ডাক দিয়েছিল তপতী। এসেছিলেন মৃণালিনী। আর তারপর, ডাক্তার মৃণালিনী চলে যাবার একটু পরেই, যেন

নিদারুণ এক লজ্জার ভারে অলস হয়ে এই ঘরেরই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল তপতী।

কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে কোন লজ্জা ছিল না। ঘুমটাই যেন একটা সার্থক গৌরবের যত উৎসবের স্বপ্ন দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলিপুরের ছোটমাসি যে অভিশাপের কথা বলেছিলেন, সেটা একটা মিথ্যা কৌতুকের কথার চেয়েও অসার। ছোটমাসির ধারণাকে মিথ্যে করে দিয়েছে তপতীর এই দেহটার অনাহত অহংকার। ঝরণার কলগীতি একটুও মৃদু হয়ে যায়নি। পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাই নতুন মাধবীলতা হয়ে ফুল ফুটিয়েছে।

হ্যাঁ, সুলেখার বাচ্চাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সেদিন সত্যই কেমন যেন একটা নির্বোধ ভাবনার ভুলে বাচ্চাটাকে ভাল করে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভুলে গিয়েছিল তপতী। সুলেখা আশ্চর্য হয়েছিল। আশ্চর্য হবারই কথা। একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে যে-মেয়ের আচরণে কোন লোভের চেষ্টা নেই, লোকে তাকে মেয়েমানুষ বলে মনে করবে কেন?

বিয়ের দিনের কথা জানিয়ে আর নিমন্ত্রণ জানিয়ে আলিপুরের ছোটমাসিকে চিঠি লিখতে গিয়ে তপতীর চোখে হঠাৎ যেন একটা গর্বের হাসিও ফুটে ওঠে।—আপনি আসবেন, সুলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, সুলেখা যেন ওর বাচ্চাটাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে।

সুমঙ্গলা আর অমিতা; দুই বান্ধবীর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে যেন আর একটা, বেশ একটু অদ্ভুত রকমের গর্বের হাসি তপতীর চোখ দুটোকে হাসিয়ে দিয়ে ঝিকঝিক করে।

নীরুদির কাছে চিঠিটাকে একটু বড় করে লিখতে হলো; আপনি যেন সকাল-সকাল, অন্তত বিকাল হবার আগেই চলে আসেন নীরুদি।

নীরুদির কাছে এত বড় চিঠি লিখতে গিয়ে যেন আর-এক রকমের একটা গর্ব, যেন একটা অসাধারণ সৌভাগ্যের গর্ব, তপতী মল্লিকের চোখের তারা দুটোকে উজ্জ্বল করে তোলে। নীরুদিও সেদিন তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাকে যেন একটু খোঁটা দিয়ে আর বেশ একটু ছোট করে দিয়ে কথা বলেছিলেন। ধরণীবাবুর মত বয়স্ক প্রবীণ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কেউ থাকতেই পারে না, যে এসে সমাদর আর শ্রদ্ধা দিয়ে তপতীর হাত ধরতে পারে। নীরুদি জানেন না যে, জর্জের বয়স তপতীর চেয়ে কিছু কমই হবে। প্রাণের নবীনতার চোখে তপতী একটা জরা হয়ে যায়নি। সত্যিই, নীরুদি সেদিন বড় বেশি শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কলেজে যাবার পালা এখন স্থগিত আছে। কাজেই তাড়া-হুড়ো নেই। চিঠিগুলিকে ডাকে ফেলে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে বিয়ের রেজিস্ট্রার অজিতবাবুকে টেলিফোন করে তপতী।

গেটের মাথার উপর বুগেনভিলিয়ার ঝাড় দুলছে, কিন্তু অনেক পাতা শুকিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ভাল দেখাচ্ছে না।

মালীকে ডাক দিয়ে, বাগানটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে তপতী। দেখতে অদ্ভুত লাগছে, সেই পুরনো বকুলটা যেন তপতীর দিকে তাকিয়ে আছে।

মালী আসতেই ব্যস্তভাবে উপদেশ দেয় তপতী—গেটের মাথার উপরে ঐ লতাগুলোর সব শুকনো পাতা সরিয়ে দাও।

॥ ছয় ॥

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিত বাবু আসবেন সন্ধ্যা হবার একটু পরে। তপতীর বিয়ের দলিলে সাক্ষী হয়ে সই করবেন আর যে দুজন তাঁরা সন্ধ্যা হতেই এসে যাবেন। কলেজের প্রিন্সিপাল মোনিকা রাসেল আর ডোরার বাবা মিষ্টার ডানকান।

আর যাদের আসবার কথা, মাসিমারা আর পিসিমারা, তাঁরা চলে আসবেন বিকাল হবার আগেই। নীরুদিকে দুপুরেই চলে আসবার জন্য অনুরোধ করে আবার চিঠি দিয়েছে তপতী। জর্জ টেলিফোনে জানিয়েছে, সে আসবে তার চারজন অভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময়। 'কি করবো বল? আমার দুর্ভাগ্য, এতদিনের মধ্যেও আমার পক্ষে কোন ভারতীয় বন্ধু পাওয়া সম্ভব হলো না।'

—তপতী! টেলিফোনেও একটা নিবিড় আহ্বানের স্বরে তপতীকে ডাক দিয়ে, তপতীর মনটাকে আরও বিহ্বল করে দিয়েছে জর্জ।

—কি বলছো; টেলিফোনে আবার ওভাবে ডাকছো কেন?

—আমার একটা অনুরোধ আছে তপতী।

—কি?

—সেই, সেদিন যেমন সেজেছিলে, ডোরার বিয়ের দিনে, ঠিক সেইরকম নীল শাড়ির সঙ্গে একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়াবে। আর···।

—আবার কি?

—খোঁপাতে রজনীগন্ধা।

—তথাস্তু। আসতে কিন্তু দেরি করো না। হ্যাঁ···কিন্তু তুমি যেন আজকের দিনেও তোমার ঐ শক্ত সার্জের কোট আর ট্রাউজারে···।

—তুমি ভুল করছো তপতী। আমি আমার দেশী সাজেই

যাব। ওটা বদলাতে পারবো না। তোমার দেশের পুরুষদের মত সাজ করতে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

—কেন?

—ভাল লাগলে ভালই ছিল, কিন্তু ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয় না।

—তার মানে, এদেশকে এখনও আপন বলে মনে করতে পারলে না জর্জ।

—কেমন করে মনে করি বল? এদেশ কি আমাকে আপন বলে মনে করতে পেরেছে?

—থাক্, আজ আর তর্ক করো না জর্জ।

—ঠিক কথা, তর্কের আর কোন দরকারই নেই।

এক গাদা রজনীগন্ধার কুঁড়ি টেবিলের মার্বেলের উপর পড়ে আছে। এখনও মিররের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় হয়নি। এখন মাত্র দুপুর। কিন্তু নীরুদির যে এরই মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা ছিল।

নীরুদি না এলে আজকের উৎসবের সব কাজের দায় সামলাবেই বা কে? এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াবার ভার খানসামা পাঁচকড়ির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। অন্তত আজকের দিনে, উৎসবের কাজটা চাকর-বাকরকে দিয়ে করানো উচিত নয়! লোকে বলবেই বা কি? কলকাতা সহরে যার এতগুলি পিসিমা মাসিমা আর কুটুম্বজন আছে, তার বিয়ের উৎসবের কাজে ব্যস্ত হবে কতগুলো চাকর-বাকর?

সেই জন্যেই নীরুদিকে তিনটে চিঠি দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে তপতী, আপনি একটু আগে না এলে আমাকে কিন্তু খুবই বিপদে ফেলা হবে নীরুদি।

গেটের দরজাটা শব্দ করে নড়ে উঠেছে। তপতীর উৎসুক

চোখ দুটো খুশি হয়ে চমকে ওঠে। একটু দেরি হলো, যাই হোক, আসতে খুব বেশি দেরি করেননি নীরুদি।

না, নীরুদি নয়। ডাকপিয়নটা আসছে। আরও খুশি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়ায় তপতী। চিঠিটাকে লুফে নেবার জন্যে তপতীর হাতদুটো যেন ছটফট করছে। নিশ্চয়, গ্লাসগো থেকে বড়দার ব্লেসিং এসেছে।

না, বড়দার ব্লেসিং নয়, নীরুদির লেখা একটা চিঠি।

—তুমি হয়তো আশা করে থাকবে, তাই জানিয়ে দিলাম, তোমার বিয়েতে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

একি ? কি-ভয়ানক অভদ্রতার কথা লিখেছেন নীরুদি।

—ভণ্ডামি করতে পারবো না ; তাই তোমার বিয়েতে যেতে পারলাম না। যে বিয়ে দেখে খুশি হব না, সে বিয়েতে গিয়ে মিছিমিছি একটা খুশির ভান করতে পারবো না। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তোমার চোখে যখন একটা ইংরেজ ছোকরাকে এত ভাল লেগেছে তখন…।

কোন্ সাহসে নীরুদি এমন করে ঠাট্টা করেন। নীরুদির দেবর বলাই যে পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে একটা ইংরেজ মেয়েকে…।

—তখন আমাদের কিছু বলবার নেই।

যাক্, নীরুদি তবু একটা কাণ্ডজ্ঞান রেখে কথাগুলি লিখেছেন।

—কিন্তু…।

এর মধ্যে আবার কিন্তু কেন ?

—কিন্তু যে রকম বিশ্রী কাণ্ড করে নিয়ে তারপর যে বিয়ে করছো, সে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমাদের সাহস নেই।

কেন ? নীরুদির অণিমা কি ঠিক এইরকমই একবছর ধরে ভালবাসার কাণ্ড করে তারপর বিয়ে করেনি ?

—আমি যাব না। তোমার পিসিমা আর মাসিমাদের কেউই যাবেন না। সকলেই লজ্জিত ও অপমানিত।

—কেন? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে ওঠে।

—কারও জানতে আর বাকি নেই যে, তুমি একটা কেলেঙ্কারীর আনন্দ পেটে পুষে রেখেছ। ছিঃ, তপতী, তুমি যে এরকম পাগল হতে পার, আমরা কেউ যে কোন দুঃস্বপ্নেও সে-ভয় কবিনি।

কেলেঙ্কারীর আনন্দ? কি-ভয়ানক হিংস্র হয়ে কথা বলছে নীরুদির চিঠিটা।

—কেমন করে জানলাম জান? আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকের মেট্রন বনবালা নিজে এসে আমাকে এই কেলেঙ্কারীর কথা বলে গিয়েছে।

বনবালা! কোন্ জগতের মানুষ এই বনবালা? সে জানবে কেমন করে, তপতীর জীবনেব ইচ্ছাটা তপতীর হৃৎপিণ্ডের গভীরে যে এরই মধ্যে একটা প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছে?

—বনবালা কেমন করে জানলো জান? ডাক্তাব মৃণালিনী বনবালাকে বলেছেন।

চিঠিটা হাতের মুঠোব মধ্যে চেপে যেন গুঁড়ো কবে দিতে চায় তপতী। হাতটা থরথর করে কাঁপে, সেই সঙ্গে চোখ দুটোও।

আর ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ঘবের ভিতরে ছুটে চলে যায়। আর মিররের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখতে পায়, ভবতোষ মল্লিকেব মেয়ে তপতী মল্লিকেব চোখ-মুখ আজ যেন একটা হিংস্র স্পর্ধায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। তপতীর জীবনের উৎসবকে বয়কট করেছে পৃথিবীর আশীর্বাদ। করুক গিয়ে, পৃথিবীর কোন ভ্রুকুটিকে ভয় করে না তপতী।

কিন্তু বুঝতে পারে তপতী, মিররেব সামনে ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তপতীর স্পর্ধাময় মূর্তিটা করুণ হয়ে গিয়েছে।

মিরেরের কাছ থেকে কখন সরে গিয়েছে, তাও জানে না। বিকেল যে হয়েছে, বাগানের গাছে কাকের কলরবও যে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তাও বুঝতে পারেনি। বিছানার উপর লুটিয়ে আর একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে তপতী।

একটা আর্তনাদ চেপে দিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে তপতী। না, আর চেপে রাখবার দরকারই বা কি? এখনই টেলিফোন করে নীরুদিকে একবার জানিয়ে দিলে হয়, কেলেঙ্কারী নয় নীরুদি, জীবনের অনেকদিনের ভুল ভাঙ্গতে গিয়ে একটু বেশি সাহস করে ফেলেছি। সাবধানে ভালবাসতে পারা যায় না, ভালবাসলে সাবধান হওয়া যায় না।

না, নীরুদিকে এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না। নীরুদি কোন্ ছাই বুঝবেন, কি ভুল করেছিল তপতীর জীবনটা, আর সে ভুল ভাঙ্গলোই বা কেমন করে?

যদি বলা যায়, মনের মত করে কাউকে পাওয়া যায় না, মনের মত হয়ে যায় বলেই তাকে পাওয়া যায়; কারও সঙ্গে কারও মিলটিল থাকে না, অমিলগুলিই ভালবাসার দায়ে মিলে যায়। তারই নাম মিলন। ভেবে-চিন্তে ভালবাসা হয় না, ভালবেসে ফেলে তবে ভাবতে হয়; জর্জকে একটা ইংরাজ ছোকরা বলে মনে করো না নীরুদি, জর্জ আমার ভুল-ভাঙ্গানো আনন্দের আবিষ্কার; তবে কি নীরুদি…।

বললে কিছুই বুঝবেন না নীরুদি; শুনে হয়তো আরও ঠাট্টা করবেন, এসব কথা হলো একটা বেশি শিক্ষিত মেয়ের কাব্যি করা বাচালতা। কেলেঙ্কারীর একটা ফিলসফি শোনাচ্ছে হিস্ট্রির এক মাষ্টারনী।

থাক্, নীরুদির মনের ঘেন্না বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। নীরুদির কাছে আবেদন করার কোন মানেও হয় না।

কিন্তু, নীরুদির চিঠির সবটা বোধহয় পড়া হয়নি। এতগুলি

বাজে কথা লিখে শেষদিকে আবার কোন্ নতুন বাজে কথাটা লিখেছেন নীরুদি ?

বিছানার উপর একটা বাজে কাগজের আবর্জনার মত পড়ে আছে নীরুদির চিঠিটা। চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার পড়তে থাকে তপতী।

—আমরা তোমার খুব নিকটজন নই। কাজেই তুমি বলতে পার, তোমার ভালমন্দের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত দুঃখ করবার কোন অধিকার নেই। বেশ তো, নেই, মেনেই নিচ্ছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেতেন। এই ঘেন্না কি তিনি সহ্য করতে পারতেন ?

বাবাও ঘেন্না করতেন ? একটা দুরন্ত বোবা জিজ্ঞাসা যেন তপতীর বুকের ভিতরটাকে গুমরে দিয়ে ছটফট করতে থাকে।

বাবার কথা ভেবেও ভয় পেয়ে বুকটা গুমরে উঠবে, এমন ভয় যে তপতীর জীবনে কোনদিন ছিল না। ভুলেই গিয়েছে তপতী, এই বাড়িটা ভবতোষ মল্লিকেরই একটা সাধের ইচ্ছার বাড়ি। তপতী নামে তাঁর মেয়েটির যথেচ্ছার বাড়ি নয়।

ঠিক, খুব সত্যি কথা বলেছেন নীরুদি, বাবাও এ বিয়েতে আশীর্বাদ করতেন না। এই ভয়ংকর সত্যের একজন সাক্ষী আজও বেঁচে আছেন, ভবতোষ মল্লিকেরই প্রাণের বন্ধু হরেনকাকাবাবু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা সমাধির মত নীরব। উৎসবটা মরেই গিয়েছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। আরও ভাল করে মরে যাক্। মানুষের আশীর্বাদ পাবে না যে উৎসব, সে উৎসবে কাজ নেই।

তপতীরই বা আর থেকে কাজ কি ? জীবনের প্রথম ভালবাসার গল্পটাকে, হোক না অনেক বেশি বয়সের মাত্রাছাড়া ভালবাসার গল্প, এখানেই ফুরিয়ে দিলে ক্ষতি কি ?

ছি-ছি! তপতী মল্লিকের স্পর্ধার অদৃষ্টটা কি-ভয়ানক অসহায়ের মত দুর্বল হয়ে আক্ষেপ করছে। বিয়ের দিনে দু-চারটে আত্মীয়জন এসে সোরগোল করতে রাজি হলো না বলেই তপতী মল্লিকের জীবনের উৎসব এত করুণ হয়ে মুসড়ে পড়বে কেন? নীরুদির একটা চিঠিতে লেখা কয়েকটা কুসংস্কারের ধমক শুনেই একেবারে নিজের জীবনেরই উপর হিংস্র হয়ে উঠতে চাইছে তপতী মল্লিকের মন; এ কেমন ভীরু মন?

কিন্তু শুধু নীরুদি তো নন, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ছোটমাসি আসবেন না। সবচেয়ে আশ্চর্য সুমঙ্গলা আর অমিতাও আসবে না। আসবার হলে ওরা কি এই দশটা দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা না দিয়ে যেত?

কি আশ্চর্য, ঐ কয়েকটা মানুষ বিয়েতে আসবে না শুনেই বিয়ের উৎসাহটাকেই এত বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছে কেন? আশা আর ভালবাসার সৌভাগ্য নিয়ে একটা একা ঘরে পড়ে থাকবার কল্পনাটা যাকে কোন মুহূর্তেও ভয় দেখাতে পারেনি, তাকে কেমন করে এত ভীরু করে দিতে পারলো নীরুদির চিঠিটা? কি এমন শক্তি আছে ঐ চিঠিতে? এত সাহস করে, জীবনের প্রতিজ্ঞাটাকে এত বিশ্বাস করে, শেষে শুভদিনটাই এমন কাঙ্গাল হয়ে গেল কেন? পরের মুখের একটু খুশির হাসি আর দুটো ভাল কথার চেঁচামেচি শোনবার জন্য আজকের শুভদিনের আত্মাটা পিপাসাতুরের মত ছটফট করে কেন?

না, নীরুদির চিঠিটা বড় বেশি ক্ষমাহীন। আজকের উৎসবের আনন্দটাকে শাস্তি দেবার জন্যই যেন কতগুলি অবুঝ অভিমান আর সংস্কার জোট বেঁধেছে। কিন্তু সত্যিই যে শাস্তি; এই কয়েকটি আত্মীয়জনের আপত্তিকে একমুঠো ধূলোর আপত্তি বলে তুচ্ছ করবার শক্তিটাও যেন তপতী মল্লিকের দুঃসাহসের বুকের

ভিতরেই শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। তা না হলে, এখনই টেলিফোনে নীরুদিকে একবার ডাক দিয়ে জোর গলায় শুনিয়ে দিতে পারা যেত, তোমরা এলে না বলে আমি একটুও দুঃখিত নই নীরুদি।

না, এমন সাহসের ভাষাটাকে চেষ্টা করেও মুখের কাছে আনতে পারা যাচ্ছে না। তপতীর চোখ দুটো এতক্ষণ ধরে একটা শুকনো জ্বালার ছোঁয়া সহ্য করে করে এইবার ভিজে গিয়ে ছলছল করতে থাকে।

ক্লান্তভাবে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার আঁকড়ে ধরে তপতী। না, আর এভাবে চুপ করে একা একা বসে থাকলে তপতীর প্রাণটা মিথ্যা ভয়ের ভ্রুকুটি দেখে দেখে শুধু চমকে উঠবে আর হাঁপাবে। এখনি চলে আসুক জর্জ। উৎসবের কলরব যখন জাগবে না, কোন অভ্যর্থনার হাসি যখন মুখর হয়ে উঠবেই না, তখন জর্জ আর কেন একটা জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যার লগ্নের অপেক্ষায় বসে থাকবে?

—জর্জ! তপতীর আহ্বানের স্বর টেলিফোনের রিসিভারের মুখের উপর যেন দুরন্ত একটা প্রার্থনার স্বরের মত লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু নো রিপ্লাই। তপতীর কানে যেন একটা নিরুত্তর জগতের শব্দ শুধু একবার ঘর্‌ঘর্‌ করেই থেমে যায়। বাড়িতে নেই জর্জ।

বাড়িতে নেই; তবে বোধ হয় বন্ধুদের বাড়িতে গিয়েছে। কারা যে জর্জের বন্ধু তাও জানা নেই তপতীর। শুধু জানে যে, ওরাও বিদেশী।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই টেলিফোনের ঝংকার শুনে তপতীর গম্ভীর মুখের বিষাদটাই যেন ছোট্ট একটা হাসির ঝংকার তুলে পালিয়ে যায়।

না, জর্জ নয়। টেলিফোনে নীরুদিরই গলার স্বর বেজে উঠেছে, নীরুদির গলার স্বরটা যেন একটা হিংস্র বিদ্রূপের রাগিনীর

উতলা ঝংকারের মত বাজছে। এক হাতে কপালটাকে যেন খিমচে ধরে নীরুদির কথা শুনতে থাকে তপতী।

নীরুদি—এ আবার কেমন খবর শুনছি, তপতী?

তপতী—কি খবর শুনলেন?

—বিয়ে নাকি হবে না?

—কে বললে?

—সুধাময়বাবু এইমাত্র টেলিফোনে এই কথা বললেন।

—কেন বললেন?

—সেই ইংরেজ ভদ্রলোক নাকি তোমাকে অবিশ্বাস করে সরে পড়েছে।

—কি বললেন? কে সরে পড়েছে?

—জর্জ ক্রিস্টফার, যার সঙ্গে তোমার আজ বিয়ে হবার কথা।

—কোথায় সরে পড়েছে?

—তা জানি না। সুধাময়বাবু বললেন, সে তোমাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক।

—কেন অনিচ্ছুক?

—তোমাকে সে সন্দেহ করে।

—কেন সন্দেহ করবে?

—বনবালা যে খবরটা আমাদের কাণে পৌঁছে দিয়েছিল, সে খবরটা নাকি জর্জও শুনতে পেয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে?

—জর্জ বুঝতে পেরেছে, তোমার এই অবস্থার জন্যে জর্জ দায়ী নয়। তোমার সঙ্গে নাকি অন্য কারও অন্তরঙ্গতা আছে।

—জর্জ একথা বলেছে?

—সুধাময়বাবু তাই তো বললেন, জর্জ তাঁকে এসব কথা বলেছে।

—কোথায় কখন জর্জ এমন কথা বললে?

—আজই বলেছে। আজ সুধাময়বাবু জর্জ ও তার কয়েকটি বিদেশী বন্ধুকে চায়ের পার্টি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছেন।

—কেন ?

—জর্জের সংস্কৃতচর্চা আর পাণ্ডিত্যের জন্য সুধাময়বাবু আর তাঁর কয়েকজন বাঙালী বন্ধু, জর্জকে অভ্যর্থনা করে একটা মানপত্র দিয়েছেন। শুনলাম ঐ চা-পার্টিতেই সুধাময়বাবুর কাছে জর্জ এসব কথা বলেছে। আর···।

—কি ?

—আরও একটা কথা বলেছে।

—কি বলেছে ?

—জর্জ আজই চলে যাবে।

—কোথায় ?

—প্রথমে দিল্লী, তারপর সোজা ইসরায়েলের টেল আভিভ ; সেখানে থেকে হিব্রু ভাষার ব্যাপার নিয়ে কি-একটা রিসার্চ করবে জর্জ।

—হিব্রু ভাষা ?

—হ্যাঁ।

—সুধাময়বাবু আর কোন খবর দেননি ?

—আর কোন্ খবর ?

—আর কারও নাম বলেননি ?

—কিসের নাম ? কার নাম ?

—হিব্রু ভাষা খুব ভাল জানেন আর কলকাতাতে থাকেন এরকম একজন ভদ্রলোকের নাম···কিংবা তাঁর মেয়েরই নাম।

—বলেছেন। কিন্তু আমি এতক্ষণ ইচ্ছে করেই সে-কথাটা তুলি নি। নামটা কি যেন বললেন···।

—মেরি কস্টেলো ?

—হ্যাঁ।

—মেরি কস্টেলোও বোধহয় টেল আভিভ যাবে।

—সুধাময়বাবু বললেন, বোধহয় মেরি কস্টেলোর সঙ্গেই জর্জের বিয়ে হবে। তবে কোথায় যে হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি।

—বেশ। এবার তবে ফোন রেখে দিই নীরুদি? সুধাময়বাবু বোধহয় আর কিছু বলেন নি।

—না, আর তো কিছু মনে পড়ছে না। যাই হোক্…।

—না, আর কিছু বলবেন না নীরুদি।

টেলিফোনের রিসিভারটা তপতী মল্লিকের হাত থেকে যেন ঝুপ করে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। যেন তপতী মল্লিকের অদৃষ্টটাই একটা বিদ্রূপের ঢিল হয়ে ঝুপ কবে আছড়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাটা এখনও ঘনিয়ে ওঠেনি। ঘরেব ভিতরের আলোও জ্বলছে না। কিন্তু নিবেট অন্ধকারের ঘরেও কুৎসিত একটা অন্ধকারময় বিভীষিকার গুমোট যেন ঘবটার বুকের ভিতরে ছম-ছম করছে।

আবার বাজতে শুরু করেছে টেলিফোন। তপতী মল্লিকের হাতটা যেন মূর্চ্ছিত রোগীর হাতের মত কোন মতে রিসিভাব আঁকড়ে ধরে কানের কাছে তুলে নেয। —কে?

— আমি সুধাময়। আপনাব ভালর জন্যই একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।

—বলুন।

—আপনি আজ ওবাড়িতে থাকবেন না। অন্য কোথাও চলে যান।

—কেন?

—জর্জ ক্রিস্টফার হয়তো আপনার কোন ক্ষতি করে দেবে। তাই অনুরোধ, আপনি চলে যান, সে যেন আপনার নাগাল না পায়।

—জর্জ ক্রিস্টফার আমার ক্ষতি করবে ?

—আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু আপনারই বা এরকমের একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস কেন যে, জর্জ ক্রিস্টফার আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ?

—হিতাকাঙ্ক্ষী না হোক্, অহিতাকাঙ্ক্ষী কেন হবে ?

—ভয়ে ?

—কিসের ভয়ে ?

—আপনি যদি কোন মামলা-টামলা করে বসেন, সেই ভয়ে।

—মামলা করবো ? কেন ?

—করতে পারেন তো। আপনার এখন যে অবস্থা, সে অবস্থার জন্যে জর্জ ক্রিস্টফারকেই দায়ী করে যদি একটা মামলা···

—শুনুন।

—বলুন।

—জর্জের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে ?

—হতে পারে।

—তবে তাকে বলবেন, তপতী মল্লিক মামলা করবে না। সে যেন কোন ভয় না করে। কিন্তু···।

—কি ?

—সে যেন আমার এখানে আর না আসে।

—বলবো। হ্যাঁ আর একটা কথা···।

—বলুন।

—সে না হয় আর আপনার ওখানে না-ই গেল, কিন্তু আপনি কি করবেন ?

—আপনি কেন একথা জিজ্ঞাসা করছেন ?

—দেখুন মিস মল্লিক, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বাঙালী, এবং সেই জন্যেই, আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ

না থাকলেও একজন বাঙালী মহিলার সম্মানের প্রশ্নটা চিন্তা না করে পারি না। আমি বলি ···।

—বলুন।

—আপনি এখনি আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে গিয়ে যদি ওদের সাহায্য নেন, তবে ওরা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে।

—রক্ষা ?

—হ্যাঁ মিস মল্লিক। ওরা সাহায্য করলে আপনি পরিষ্কার হয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসতে পারবেন। কাজেই, আপনার এই বয়সের সম্মানের প্রশ্ন নিয়ে বিশ্রী একটা বিপদে পড়বার ভয় থেকে বেঁচে যাবেন।

টেলিফোনের রিসিভারটা আবার তপতী মল্লিকের হাত থেকে ঝুপ করে খসে পড়ে। যেন একটা বোবা আর্তনাদের পিণ্ড ঝুপ করে নিষ্ঠুর এক বলিদানের হাড়িকাঠের উপর আছড়ে পড়েছে।

বেশিক্ষণ নয়, সোফার উপর একটা মৃতদেহের মত পড়ে থাকা শরীরটা যেন হঠাৎ এক বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন এই মুহূর্তে সরে পড়তে, ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে তপতী মল্লিকের যন্ত্রণাক্ত এই শরীরটা।

না, আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে যাবার কোন দরকার নেই। কিসের স্বার্থে, কার জন্যে, হৃৎপিণ্ডহীন একটা শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবে তপতী মল্লিক ? এই জীবনটা যখন পঁয়তাল্লিশ বছরের নিছক ঠাট্টার, ভুলের আর মিথ্যে দুঃসাহসের গল্প, তখন সে গল্পকে এখনই এই মুহূর্তে ফুরিয়ে দিলেই তো হয়।

হ্যাঁ, এখনই ফুরিয়ে দিতে হয়।

হেসে ফেলে তপতী। অদ্ভুত একটা শান্ত প্রতিজ্ঞার জ্বলজ্বলে হাসি। সে হাসিটাকে একবার দু'চোখ দিয়ে দেখে নিতেও

ইচ্ছে করে। নিজের মুখের এই হাসি দেখবার জন্য লোভীর মত ব্যস্ত হয়ে মিররের কাছে এসে দাঁড়ায় তপতী।

আর দেরী করবার সময়ও যে নেই। সন্ধ্যাটা আর একটু কালো হয়ে গেলেই যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতবাবু এসে পড়বেন।

হাল্কা গোলাপী সেই বেনারসীটা; আর সেই কাশ্মীরী শালটা। সেজে ফেলতে একটুও দেরি করে না তপতী।

বিছানার উপর থেকে নীরুদির লেখা পরম অভিযোগের চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে, শুধু কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। কি-যেন ভাবে; তারপর আর দেরি করে না। ছোট আলমারিটার ভিতর থেকে যেন একটা পরম নিষ্কৃতির আনন্দ লুফে নিয়ে নীচে নেমে যায়।

ড্রইং রুমের ভিতরে ঢুকে, টেবিলের মার্বেলের উপর স্তবক করে সাজিয়ে রাখা রজনীগন্ধার এক গাদা কুঁড়ির পাশে দুটি পরম নিদর্শন রেখে দিয়ে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। নীরুদির চিঠিটা আর করাল আরকের শিশিটা; তপতী মল্লিকের অদৃষ্টের মামলার বিচার আর রায়। সারা মুখ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে প্রতিজ্ঞাময় সেই শান্ত হাসিটা। রজনীগন্ধার কুঁড়িও খোঁপায় গেঁথে নিতে দেরি করে না তপতী।

বাস্, আর তো কোন কাজ নেই।

—তপতী।

কি আশ্চর্য? বাধা দিল কে? ডাক শুনে তপতীর খোঁপার রজনীগন্ধা কেঁপে ওঠে।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই হরেনবাবু বলেন—আমার অবিশ্যি এখানে আসবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। তবু এলাম।

তপতীর কাছ থেকে শোনবার আশায় নয়, চশমাটাকেও একটু

মুছে নেবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য কথা থামিয়ে আবার কথা বলেন হরেনবাবু।—কলকাতাতেও আসবার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চলে এলাম।

তপতীর ঠোঁট দুটো হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে।—দুঃস্বপ্ন দেখে?

—হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নেরই মত একটা খবর পেয়ে।

—কবে?

—এই দিন তিন-চার হলো।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে কোন চিঠি লিখিনি।

—তুমি লিখবে কেন? সলিসিটর নেপাল লিখেছে। আমার পূর্ণিমার আলোর ট্রাস্ট ডীডের ভাষাটা নাকি বদলাবার দরকার আছে। ভাষার মধ্যে নাকি জাতিবিদ্বেষের কথা আছে। সাদা জাতের রক্তের ছোঁয়া আছে, এমন কোন শিশু আমার পূর্ণিমার আলোতে ঠাঁই পাবে না, ডীডে এই কথাটা থাকলে নাকি গবর্ণমেণ্ট অসুবিধায় পড়বে। আমি মরে যাবার পরে আমার বাড়িতে শিশু-আশ্রম করতে গবর্ণমেণ্ট এরকম সর্তে রাজি হবেন না।

চশমাটা চোখে পরিয়ে নিয়ে হরেনবাবু যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় থরথর করে কেঁপে ওঠেন।—আমি কিন্তু একটি লাইনও বদলাবো না। আমার ঘেন্নার কোন নড়চড় হতে দেব না। যাক্ সে-কথা···আমি এসেছি একবার জেনে যেতে, সত্যিই কি তোমার বিয়ে?

—কে বললে?

—আমার বাড়ির ভাড়াটে চক্রধরবাবু বললেন।

—ঠিকই বলেছেন।

—কার সঙ্গে বিয়ে?

—জর্জ ক্রিস্টফারের সঙ্গে।

—কি জাত?

—ইংরেজ।

—ইংরেজ কেন? তোমার সঙ্গে একটা ইংরেজের বিয়ে হবে কেন?

—বিয়ে হওয়া উচিত।

—বেশ কথা। কবে বিয়ে?

—আজ।

—কখন?

—এখনি।

—তার মানে? যদি বিয়ে বাড়ি, তবে বাড়ি এত ফাঁকা কেন?

—কেউ আসবে না।

—কেন আসবে না?

—কোন মাসিমা, কোন পিসিমা, এমন কি নীরুদিও আসবেন না জানিয়েছেন।

—কেন?

—ওঁরা এই বিয়েতে আশীর্বাদ করতে পারবেন না।

—তাই বল।

হরেনবাবু জোরে একটা হাঁফ ছেড়ে এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারলেন। ফুরফুর করে উড়ছে ঘরের দরজার পর্দাটা, সেই দিকেই তাকিয়ে আর লাঠি ভর দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান হরেনবাবু।

—আমি চলি। তপতীর মুখের দিকে একটা ভ্রুক্ষেপ করবারও চেষ্টা না করে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, যেন ভবতোষের এই বাড়ির সান্নিধ্য থেকে তাঁর চিরকালের অন্তর্ধান এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ করে দেবার জন্য চলে যেতে থাকেন হরেনবাবু।

ঘুমন্ত পাখির কাকলীর মত মৃদুস্বরে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে তপতী—আপনিও কি…।

—না না, আমি কিছু না, আমি পারবো না। আমাকে আর কোন কথা বলো না, তপতী।

কথা শেষ করে তপতীর দিকে একটা ভ্রুক্ষেপ করতে গিয়েই চমকে ওঠেন হরেনবাবু।

একি ? ভবতোষের মেয়ে তপতীর মুখটা এরকম হয়ে গিয়েছে কেন ? দেখতে যে···সত্যিই যে মনে হচ্ছে তপতীর মা জয়ার সেই মুখটা, মরে যাবার এক মিনিট আগে যে ফ্যাকাসে মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে, ঠোঁটে হাসি আর চোখে জল নিয়ে একটা শূন্যতার দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

—কি হলো তপতী ? আস্তে আস্তে ডাকেন হরেনবাবু।

—আপনি শুনে খুশি হয়ে চলে যান কাকাবাবু, বিয়ে হবে না।

—কেন ?

—আমি এখনই চলে যাব। আমি আর এ বাড়িতে থাকবো না।

—এমন জেদই বা কেন ? কে তোমাকে চলে যেতে বলছে ?

—কেউ বলেনি, আমিই বলছি।

—কোথায় যাবে ?

—আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না কাকাবাবু।

—আমাকে এত অসম্মান করে কথা বলতে তোমার কি··! বলতে বলতে কাঁপতে থাকেন হরেনবাবু। ভবতোষের বাড়িটাকে চিরকালের মত শূন্য করে দেবার কুৎসিত গর্বে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কথা বলছে ভবতোষেরই মেয়ে ?

হঠাৎ হরেনবাবুর এই রুষ্ট মূর্তির সব কাঁপুনি যেন আরও তীব্র একটা বেদনায় আহত হয়ে চমকে ওঠে। শ্বাসকষ্টের হিক্কার মত একটা করুণ অথচ কঠোর শব্দ হরেনবাবুর বুক কাঁপিয়ে দিয়ে বেজে ওঠে। চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন হরেনবাবুও, কিন্তু কথা বলবার শক্তিটা যেন দুঃসহ এক ক্লান্তির ভারে অবসন্ন হয়ে বিড় বিড় করে। —না, ভুল কথা বলেছি। আমাকে ঘেন্না করে কথা বলতে তোমার এখন কোন অসুবিধে নেই। যে মেয়ে একটা বিজাতকে বিয়ে করতে পারে, সে অনায়াসে তার বাপের বন্ধুকে অপমান করে

কথা বলতে পারে। বাপের বন্ধুটা যে নিতান্ত একটা দেশী মানুষ। আমি আজ তোমার কাছে একটা বুড়ো নেটিভ ছাড়া আর কিছু নই।

তপতী—বিজাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, কাকাবাবু। এ বাড়িতে না, কোন বাড়িতেই না। আমিই শুধু চলে যাব।

—বিয়ে হবে না মানে?

—সে আমাকে বিয়ে করবে না।

—তবে বিয়ের তারিখ ঠিক হলো কেন?

—বিয়ে হওয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু···

—কি?

—আজই জানা গেল, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়।

—কি কারণে?

—সে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবে?

—এ সত্যটা কি আজই জানতে পেলে?

—হ্যাঁ।

—আগে কোনদিন সন্দেহ হয়নি?

—না।

—এমন অন্ধতাও তোমার হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—এখন ভুল ভেঙ্গেছে?

—ভেঙ্গেছে।

—এখনও বিশ্বাস করতে পারছো কি, কেন ঐ ইংরেজটা তোমার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল?

—বুঝেছি, শুধু ঘেন্না করে আর অপমান করে চলে যাবার জন্য।

—শুনে সুখী হলাম। কিন্তু তবে আর এবাড়ির উপর অভিমান কেন? কোথায় যেতে চাইছ তপতী?

হরেনবাবুর গলার স্বর যেন হঠাৎ স্নেহাক্ত হয়ে গলে যায়।—অভিশাপ থেকে, মস্ত অকল্যাণ থেকে বেঁচে গেছ তপতী। ওজাত

কখনও তোমার জাতের আপনজন, আর তোমারও আপনজন হতে পারে না। বিয়ে যে হলো না, তাতে আরও ভয়ানক অপমান থেকে বেঁচে গিয়েছ। ওদের ছায়ার কাছে যেতেও আমাদের ঘেন্না বোধ করা উচিত। ওদের রক্তের মধ্যে ক্লাইভ ডায়ার আর ড্রেক কিলবিল করছে। ওরা...।

হাঁপাতে হাঁপাতে কি একটা কথা বলতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যান হরেনবাবু, আর গলার স্বরটা যেন স্বপ্নে বোবায়-ধরা মানুষের গলার স্বরের মত গোঙিয়ে ওঠে।

—অ্যাঁ? ওকি? তুমি কি ভেবেছ তপতী? টেবিলের মার্বেলের ওপর ওটা কি?

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে একটা শিশির দিকে তাকিয়ে হরেনবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন অসহায় কাঁদুনে শিশুর চোখের মত ছলছল করে। —তুমি কাকে শাস্তি দিতে চাইছো তপতী?

—নিজেকে।

—কেন?

টেবিলের মার্বেলের উপর কুকড়ে পড়ে থাকা নীরুদির চিঠিটাকে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে তপতী। —ভুল করেছি; আমি মানুষের চোখের ঘেন্না হয়ে গিয়েছি কাকাবাবু। আমাকে আশীর্বাদ করবার সাহস কারও নেই।

নীরুদির চিঠিটাকে চোখের কাছে তুলে ধরে, আর পড়া শেষ করে একেবারে ধীর-স্থির আর অবিচল একটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন হরেনবাবু। মনে হয়, নীরুদির চিঠির কথাগুলি যেন নীরব বজ্রের মত হরেনবাবুর বুকের উপর ফেটে পড়ে তাঁর প্রাণহীন একটা মৃতদেহকে শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছে; বজ্রপাতের আঘাতে ফাটা-ফাটা হয়েও তালগাছ যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। ভবতোষের মেয়েটা সত্যিই যে একটা সাদা বিজাতের লালসার বিষ খেয়েছে, জীবনের শুচিতার গায়ে নিদারুণ অপমানের কালি মাখিয়েছে।

শেষজীবনে এরকম একটা অভিশাপের জয়ধ্বনি শোনবার জন্যই কি হরেনবাবুর প্রাণটা আশি বছরের আয়ু পেয়েছিল?

চেঁচিয়ে ওঠেন হরেনবাবু—খুব ভাল খবর। চমৎকার খবর। তুমি তোমার সখের ভুলে সারা দেশটাকে, সারা জাতটাকে, অসাদা মানুষের জগতটারই অপমান ঘটিয়েছ তপতী। তোমাকে ক্ষমা করবার সাহস আমার নেই। তোমাকে ক্ষমা করতে একটুও ইচ্ছে নেই। আমার গা ঘিনঘিন করছে তপতী।

চিঠির লেখাগুলির গায়ের উপর আশি বছর বয়সের চশমা-পরা দৃষ্টিটাকে একেবারে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আর একবার চিঠিটা পড়তে থাকেন হরেনবাবু। হরেনবাবুর কঠিন মূর্তিটা এইবার কাঁপতে থাকে, তারপর টলতে থাকে, তারপরেই চিঠিটাকে দুমড়ে আর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেন নিজের বুকের ভিতরের একটা হঠাৎ মাতাল অনুভবের সঙ্গে পাগলের মত বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে—ভুল? ভুলটা যে আমাদের ভবতোষের নাতি।

তারপরেই একেবারে অভিমানী শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন হরেনবাবু। আশি বছরের দুটো কঠোর গর্বের চোখ থেকে অঝোরে কান্নার জল ঝরে পড়তে থাকে।--ওজাতের ওপর আমার বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেল তপতী। কিন্তু··তবু তোমাকে বিষের শিশি ছুঁতে দেব না, কখ্‌খনো না। তোমার এসব পাগলামির মতলব চলবে না। তোমাকে শাস্তি দেবার কোন অধিকার তোমারও আজ নেই।

শিশিটাকে তুলে নিয়ে জানলার বাইরে পাঁচিলটারও ওপারে বড় ড্রেনটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন হরেনবাবু।

—না, তোমাকে আর কিছু বলবার নেই, তপতী। তুমি শুধু বেঁচে থাক: এ ছাড়া তোমাকে অনুরোধ করবার আর কিছু নেই। আমি চলি!

তপতী—কিন্তু আর একটা কথা বলে দিয়ে যান কাকাবাবু।

—আর কি কথা জানতে চাও ?

তপতী—আমি কি একটা বে-আইনী জীব হয়ে আর বে-আইনী একটা শিশুকে কোলে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবো ?

হরেনবাবুর আবার থর থর করে কাঁপতে থাকেন।—না, এত বড় শাস্তি সহ্য করো না। হাসপাতালের কেবিন থেকে ভবতোষের নাতিকে আর এবাড়িতে নিয়ে এস না। ঐ যে···এখান থেকে বেশি দূব নয়—ঐ লিটল্ ফ্লাওয়ার্স অরফ্যানেজে তাকে দান করে দিও। ভবতোষের বাড়িটা জাতের অপমানের স্মৃতিসৌধ হয়ে একেবারে শূন্য হয়ে পড়ে থাকুক।

লাঠি ঠকে ঠকে অন্ধের মত, দুর্ঘটনায় আহত একটা যন্ত্রণাক্ত মানুষের মত, যেন আশি বছরের গর্বের মেরুদণ্ডটা এতদিনে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে, আস্তে আস্তে পা চালিয়ে ড্রইংরুমের দরজা পার হয়ে চলে যেতে থাকেন হরেনবাবু।

গেটের কাছে গাড়ির হর্ণ শুনেই বারান্দার উপর থমকে দাঁড়ান হরেনবাবু।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতবাবু এসে বারান্দায় উঠেই ব্যস্তভাবে হাসেন—আপনারা সবাই প্রস্তুত তো ?

—পাঁচকড়ি! পাঁচকড়ি! আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ডাক দেন হরেনবাবু।—শিগগির এস পাঁচকড়ি, আমাকে হাত ধরে ফটকটা পর্যন্ত পৌঁছে দাও। আমি বোধহয় পড়ে যাব পাঁচকড়ি, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

অজিতবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে হরেনবাবুর হাত ধরেন। —কোন ভয় নেই। পড়ে যাবেন কেন ?

হরেনবাবু—আপনি নিশ্চয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতেন্দু নাগ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো আমাকে আগে কয়েকবার দেখেছেন।

হরেনবাবু—দেখেছি। মনে পড়েছে। আচ্ছা, মেনি থ্যাঙ্কস্, আমাকে এখন ছেড়ে দিন। আমি একাই চলে যেতে পারবো।

অজিতবাবু—আচ্ছা, আসুন তাহলে। কিন্তু দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।

—কেন ?

—জর্জ ক্রিস্টফার আমাকে, এই তো দশ মিনিট হলো, টেলিফোনে জানিয়েছে যে, দশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে। সুতরাং এখনি এসে পড়বে।

ড্রইংরুমের দরজার পর্দাটাই যেন উতলা হয়ে দুলে ওঠে। ঘরের ভিতর থেকে আতঙ্কিত বিস্মিত করুণ ও অসহায় একটা মূর্তির মত ছুটে বের হয়ে আসে তপতী—যাবেন না কাকাবাবু।

হরেনবাবুব মূতিটাও স্তব্ধ বিস্ময়ের মূর্তির মত বারান্দার সিঁড়ির উপর থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু কাঁপতে থাকে হবেন-বাবুব গলার স্বর—জর্জ ক্রিস্টফার কেন আসবে ? কিসের জন্য ? কি উদ্দেশ্যে ? কোন্ সাহসে ?

অজিতবাবু অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে, আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন ?

অজিতবাবু কিন্তু তাঁব এই বিস্ময়ের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর শুনতে পেলেন না ; কারণ, হরেনবাবু কোন কথা বলবারই আর সুযোগ পেলেন না। গেটের কাছে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। তিনজন ইউরোপীয়ান যুবক হেসে হেসে আব কথা বলে বলে, সুস্মিত অথচ অনাড়ম্বর একটা প্রীতির মিছিলের মত স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসতে থাকে।

ওদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর করে সেজেছে যে, যার ক্রীম রঙের সিল্কের স্যুটও অদ্ভুত এক কোমলতার হাসি হেসে চিকচিক করছে, বুকের বোতামের ঘরে একটা হলদে গোলাপ গোঁজা আর গলাতেও বাদামবরণ একটি ফুরফুরে সিল্কের টাই, সেই যুবকটিই বারান্দায় উঠে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আসতে

একটু দেরি হলো তপতী, কিন্তু সেটা আমার কোন ইচ্ছে-করা অন্যায় নয়।

তপতী শুধু বোবা বিস্ময়ের প্রতিমূর্তির মত, যেন শুধু দুটো অপলক চোখের চাহনি দিয়ে জর্জের এই বিচিত্র বাচালতার শব্দ শুনতে থাকে।

জর্জ হাসে—কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক তোমারই দেশের মানুষ; আর, তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই, শুনলাম তোমাকে বিয়ে করতেও সে রাজি হয়নি, তবু সে তোমার নামে অদ্ভুত সব অভিযোগের কথা আমাকেই শুনিয়ে দিলো। আরও বুঝলাম, সে-সব কথা আমাকে শোনাবার জন্য তিন'শ টাকা খরচ করে সে একটা চায়ের আসর ডেকে আমাকে অভ্যর্থনাও জানিয়েছে। মানুষের অনিষ্ট করবার জন্যে ভদ্রলোক শুধু টাকা খরচ করা কেন, বোধহয় শহীদের মত প্রাণপাতও করতে পারে।

—কার কথা বলছো? তপতীর বুকের স্তব্ধ বিস্ময়টাই যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

জর্জ হাসে—তার নাম সুধাময় রায়। লাভ নেই, স্বার্থ নেই; দেশের একটা মানুষ অপমানিত হবে, শুধু এই ভেবেই আনন্দিত। জানি না, এরকম চরিত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, জর্জ ক্রিস্টফারের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হরেনবাবুর চোখের তারায় যেন একটা চাপা আগুনের স্ফুলিঙ্গ চমকে ওঠে।

জর্জ হাসে—সে ভদ্রলোক আমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ভঙ্গীতে কতই না উপদেশ দিলো। তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপমান; তোমার চরিত্র সন্দেহাতীত নয়; তুমি নাকি এক রহস্যময়ী ছলনা; সুতরাং, আমার নাকি মেরি কস্টেলোকেই বিয়ে করা উচিত। তাছাড়া ইণ্ডিয়া ছেড়ে দিয়ে, সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে, তোমাকেও ছেড়ে দিয়ে সোজা যেন টেল আভিভে গিয়ে হিব্রু

নিয়ে আর মেরি কস্টেলোকে নিয়ে···বলতে বলতে হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জর্জ। সঙ্গী বন্ধু দুজনও হেসে ফেলে।

জর্জ বলে—আমার দুই জার্মান বন্ধু।

—তপতী! চেঁচিয়ে, যেন দুর্বার একটা উৎসাহের আবেশে হঠাৎ ডাক দিয়েছেন হরেনবাবু। চোখের তারার সেই স্ফুলিঙ্গ নিভে গিয়ে চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তপতী শুধু একজোড়া হতভম্ব চোখ তুলে হরেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হরেনবাবু বলেন—জর্জকে আর ওর বন্ধু দু'জনকে ঘরের ভেতরে বসতে বলতে ভুলে যাচ্ছ কেন, তপতী?

বলতে বলতে হরেনবাবু নিজেই এগিয়ে আসেন। আর এগিয়ে এসেই যেন দুর্বার এক আগ্রহের ঝোঁকে অজিতবাবুর একটা হাত ধরে ফেলেন—আসুন, আর দেরি করবার তো কোন মানে হয় না।

ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেই জর্জের কাছে এগিয়ে যেয়ে, আর জর্জের মুখটার দিকে যেন তীব্র তীক্ষ্ণ অথচ বিস্ময়ে অভিভূত একটা অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন হরেনবাবু।

তপতী জর্জের দিকে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি তুলে কথা বলে—হরেনকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বল, জর্জ।

হরেনবাবুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চেচিয়ে ওঠে জর্জ।—আপনি কবে এসেছেন কাকাবাবু? কী সৌভাগ্য, আজকের দিনে আপনি এসেছেন!

হরেনবাবু—তুমি সুধাময়ের কথা শুনেও আসতে পারলে কেমন করে?

জর্জ হাসে—সুধাময়ের কথা শুনে তপতীর জন্য আমার মায়া আরও বেড়ে গেল কাকাবাবু; তাই আরও খুশি হয়ে ছুটে এসেছি।

হরেনবাবু—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জর্জ, তুমি সুধাময়ের কথাগুলিকে এত সহজে তুচ্ছ করলে কেমন করে?

জর্জ—সুধাময়দের কথা তুচ্ছ করতে পারি বলেই আমি··· শুধু আমি কেন, আমার দেশটাও নিজের ক্ষতি করবার অভিশাপ থেকে বেঁচে যায়। আপনার দেশ কিন্তু নিজেই নিজের ক্ষতি আর অপমান করবার জন্য অদ্ভুত একটা চেষ্টার আনন্দে···।

—চুপ চুপ। থাম জর্জ ক্রিস্টফার। এত গর্ব করে কথা না বললেও তোমাকে আমি সত্যবাদী বলে মনে করবো। কথাটা বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেও, হরেনবাবুর গলার স্বরের ভিতরে যেন লজ্জাতুর একটা আর্তনাদ শিউরে ওঠে। মাথাটাও যেন হেঁট হয়ে যেতে চাইছে।

জর্জ বলে—তপতী একদিন রাগ করে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল কাকাবাবু।

হরেনবাবু—কিসের তর্ক?

জর্জ—আমি বলেছিলাম, ক্লাইভ লোকটা খারাপ ছিল, কিন্তু তোমার দেশ তাকে আরও খারাপ করে দিয়েছিল।

হরেনবাবু—তার মানে?

জর্জ—তার মানে, সুধাময়দের চেষ্টা সফল হয়েছিল।

হরেনবাবু—তুমি আবাব বড় বেশী গর্ব করে কথা বলছ জর্জ।

জর্জ—বলতে দিন কাকাবাবু। তপতীকে বুঝতে দিন, আমি ক্লাইভ দি অ্যাডভেঞ্চারার নই।

হরেনবাবু হাসতে চেষ্টা করেন—তপতী নিশ্চয় বুঝেছে।

জর্জ—আমি তপতীকে আর একটা সত্য কথা বলতে একটুও দ্বিধা করিনি কাকাবাবু।

—কি কথা?

—আমি আপনাদের দেশকে ভালবাসতে পারিনি, কিন্তু আপনাদের মেয়েকে ভালবাসতে পেরেছি। আমি এদেশকে কোনদিন আপন করে নিতে পারবো না, কিন্তু তপতীকে আপনজন বলে মেনে নিতে পেরেছি।

—এদেশকে আপন বলে মেনে নিতে তোমার আজ বাধা কোথায় ?

—বাধা আছে।

—কিসের বাধা ? না, কোন বাধা নেই। তোমার একটা গর্বের বাধা ছাড়া আর কোন বাধা নেই।

—না কাকাবাবু। আমার একটা সন্দেহের বাধা।

—ভুল সন্দেহ।

—খুব সত্যি সন্দেহ। ইতিহাসের এই টিচার স্বীকার করবেন না জানি, কিন্তু আমি জানি,···কিন্তু আপনার সঙ্গে আজ তর্ক করা উচিত নয় কাকাবাবু।

অজিতবাবু হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।—এখন শুভ কাজ শুরু হলেই ভাল হয়।

বারান্দার উপব দু'জন নতুন আগন্তুকের সহাস্য কলরব বেজে ওঠে। হ্যাঁ, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মোনিকা রাসেল আর ডোরার বাবা মিষ্টার ডানকানও এসেছেন।

—কিন্তু এ কেমন বিয়ে ? তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিদারুণ একটা অখুশির মূর্তির মত চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করেন হরেন-কাকাবাবু।

তপতীর মুখটা করুণ হয়ে যায়।—কি বলছেন কাকাবাবু ? বুঝতে পারছি না।

—এটা কি বিয়ে করা হচ্ছে, না চুরি করা হচ্ছে ? শুধু একটা খাতা সাক্ষী করে বিয়ে হবে কেন ? এদেশে কি মানুষ নেই ?

তপতী—নীরুদিরা কেউ তো আসবেন না।

হরেনবাবু—নীরুরা না এলেই কি তোমার বিয়েটা একেবারে ভীরু হয়ে যাবে ? একটা শাঁখও না বাজিয়ে···ছিঃ, অসম্ভব, হতেই পারে না। এদেশটা তো আর জর্জের দেশ নয়।

অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল আবেদনের মত স্বরে

অনুরোধ করেন হরেনবাবু। —আপনি একটু সবুর করুন অজিতবাবু। আপনার কাজ ঠিকই নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে, সামান্য ছুটো ঘণ্টার অপেক্ষা সহ্য করুন ; প্লীজ, আমার অনুরোধ।

ব্যস্তভাবে ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে এসে, আর বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দেন হরেনবাবু—পাঁচকড়ি, শীগগির এস।

—কি আজ্ঞা কর্তা ? পাঁচকড়ি ব্যস্তভাবে ছুটে এসে হরেনবাবুর আদেশ শুনতে চায়।

—যাও, এখনি গিয়ে চক্রধরবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

চলে যায় খানসামা পাঁচকড়ি। কিন্তু বারান্দার উপর লাঠিভর দিয়ে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক ডাক করতেই থাকেন হরেনবাবু। —মালী কোথায় আছ ? বেয়ারা যতীন কোথায় ? কোথায় চুপ করে বসে আছ সবাই। এখনি এসে কথা শুনে যাও।

হরেনবাবু যেন একটা প্রতিজ্ঞার মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ভবতোষের বাড়িতে একটা আশার উৎসবের সোরগোল জাগিয়ে তুলতে থাকেন।

মালী আর যতীন বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করে। পাঁচকড়ি ছুটে গিয়ে চক্রধরবাবুকে ডেকে আনে। চক্রধরবাবু আবার সেই মুহূর্তে চলে যান। দশ মিনিটের মধ্যে দশ-বারটি সধবা মহিলা, জন পনর ভদ্রলোক আর বিশ-ত্রিশটা ছেলে-মেয়ের হুটোপুটি ব্যস্ততা আর সোরগোল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হৈ হৈ করতে থাকে ভবতোষের বাড়িটা। বিয়ের কাজে খাটবার জন্য হরেনবাবুর বাড়ির যত ভাড়াটে পরিবারের প্রায় সব মানুষ এসে পড়েছে। সবই হরেনবাবুর ইচ্ছার কাণ্ড।

হরেনবাবুর ইচ্ছা, বর বরণ করতে হবে। একেবারে খাঁটি বাঙালী মতে, বরণডালা সাজিয়ে, কুলোর উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে, খই ছুঁড়ে আর শাঁখ বাজিয়ে।

ট্যাক্সি নিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলে যান চক্রধরবাবু ; আর আধঘণ্টার মধ্যেই বর বরণের সব উপকরণ হাজির করেন।

—আলপনা দেওয়া হয়েছে? হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন হরেনবাবু।

চক্রধরবাবুর স্ত্রী এসে বলে যান—হ্যাঁ, আরতির মা আর টুলুর মা আলপনা দিতে শুরু করেছে।

—মার্কেট থেকে ফিরেছে কি পাঁচকড়ি? চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন হরেনবাবু।

—হ্যাঁ ফিরেছে। মালী ছুটে এসে জানিয়ে যায়।

—চায়ের জল চড়ানো হয়েছে?

—হয়েছে। যতীন বেয়ারা এসে জানিয়ে যায়।

—আর খাবার?

—হ্যাঁ, ও বাড়ীব মেয়েরা খাবার সাজাতে লেগেছেন।

—মেয়েব কাছে কেউ আছে তো?

চক্রধরবাবু হেসে ফেলেন—বাচ্চা-কাচ্চারা সবাই তো মেয়েকে ঘিরে রেখেছে।

বারান্দার একটা চেয়াবের উপর যেন একটা মুক্তিময় আনন্দের ভাবে একেবারে অলস হয়ে বসে পড়েন হরেনবাবু। আর ব্যস্ত হতে কোন ইচ্ছে নেই। আব কোন চিন্তাও নেই। ভবতোষের বাড়িটা এবার নাতি-নাতনি নিয়ে···।

চোখ বুঁজে, আর, যেন পরম আলস্যময় একটা তৃপ্তির ভারে নিঃস্পন্দ হয়ে চেয়ারের উপর অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকার পর হরেনবাবুর এই অদ্ভুত মূর্তির বুকটা হঠাৎ আবার একটা ডাক শুনে চমকে ওঠে।—কে? তুমি কে?

—আমি জর্জ।

চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করেন হবেনবাবু।—কি ব্যাপার জর্জ? তুমি আবার ঘরের বাইরে এলে কেন?

জর্জ—আমার সন্দেহটা যে জব্দ হয়ে গেল।

হরেনবাবু—কি বললে?

জর্জ কুণ্ঠিতভাবে হাসে—আমাদের বিয়েটা যে সত্যিই উৎসব হয়ে উঠলো কাকাবাবু?

—তা তো হবেই।

—সকলে এতে খুশি?

—নিশ্চয়।

– তবে আমাকে একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসতে অনুমতি দিন।

—কেন?

—আমার এই পোষাক এই উৎসবে একটুও মানাচ্ছে না। পোষাকটা বদলে আসি।

—কেন?

—এই উৎসবে ধুতি-চাদর ছাড়া আমাকে অন্য পোষাকে একটুও ভাল দেখাবে না।

—কে বললে?

—আমি বলছি। আমার এই সাজ যে নিতান্ত বিদেশী সাজ।

—তুমি কি তবে এদেশী সাজে···।

—নিশ্চয়, যে-দেশের এতগুলি মানুষ এত খুশির উৎসব দিয়ে আমাকে আপন করে নিতে চাইছে, সে-দেশে বিদেশী হয়ে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই, সাধ্যিও নেই।

জর্জ ক্রিস্টফারের একটা হাত কাছে টেনে নিয়ে সেই হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হেসে, যেন নিবিড় এক নিশ্চিন্তভাব আবেশে কথা বলেন হরেনবাবু—তুমি ঘরে গিয়ে বসো। আমি এখনই তোমাব জন্য চমৎকার এক সেট বরের সাজ আনিয়ে দিচ্ছি।

জর্জ—আপনি বিশ্বাস করুন; একটা ফর্মালিটির সঙ সাজবার জন্য নয়, আমি এ দেশের ঘরের মানুষ হয়ে যেতে চাই। আপনার ব্লেসিং চাই কাকাবাবু।

হরেনবাবু—আই ব্লেস ইউ।

জর্জ চলে যেতেই চেয়ারের উপরে একটু টান হয়ে নড়ে বসেন হরেনবাবু। শাঁখের শব্দ, পোড়া ধূপকাঠির গন্ধ আর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে চক্রধরবাবুর দৌড়াদৌড়ির মত্ততা, হরেনবাবুর প্রাণটাই যেন শিরদাঁড়া টান করে একটা জয়ের দৃশ্য দেখছে। কেন যেন মনে হয়, আর মনের এই অদ্ভুত অনুভবের সঙ্গে তর্ক করবার কোন যুক্তিও খুঁজে পান না; যেন অনেক দিনের পুরনো একটা রোগের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে অদ্ভুত এক স্বস্তির সুখে তাঁর আশি বছর বয়সের প্রাণটা আজ ভরে গিয়েছে। জর্জকে একবার কাছে ডেকে নিয়ে এসে একটু ঠাট্টা করলে হয়—এবারের পলাশীর যুদ্ধে তুমি কিন্তু আমাদের হারিয়ে দিতে পারলে না জর্জ। মনে হচ্ছে, আমাদেরই জয় হয়েছে।

হরেনবাবুর জাগ্রত চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে যেন চকিত তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেন দেখতে পাওয়া যায়, ভবতোষের মুখটা হাসছে। সেই কবেকার ভবতোষ, বাইশ বছর বয়সের কেরাণী বাঙালী ভবতোষ; বড় সাহেবের বাচ্চা মেয়েটাকে চুমো খাবার পর মেমসাহেবের ধমক খেয়েও হাসছে। হেসে হেসে সেই অদ্ভুত কথাটাই বলছে ভবতোষ, আমি কিন্তু মুখ মুছবো না হরেন। আঃ, কী শান্ত সুন্দর নির্বিকার আর নীরোগ মানুষের হাসি।

—হ্যাঁ ভবতোষ, মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তোমারই হাসিটার জয় হলো। হরেনবাবুর মুখটা বিড়বিড় করে না, কিন্তু সত্যই যেন শুনতে পাচ্ছেন, প্রাণটা কথা বলছে।

কিন্তু বর বরণ হবে কখন, আর কত দেরি?

শুনতে পান হরেনবাবু, অজিতবাবু কা'কে যেন বলছেন—না না, আমার দেখতে খুব ভাল লাগছে। আমি আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজি আছি। আগে আপনাদের দেশী মতে সব অনুষ্ঠান হয়ে যাক্, তারপর আমার খাতা।

মনে হয় চক্রধরবাবু উত্তর দিলেন—আর আধঘণ্টার মধ্যে সব হয়ে যাবে স্যার।

না, হরেনবাবুর আর ব্যস্ত হয়ে ওঠবার কোন দরকার নেই। আজকের আকাশের তৃতীয়ার চাঁদটাই যেন শুভকাজের সব দায় স্বীকার করে নিয়েছে।

তাইতো, আবার যে একটু ব্যস্ত হতে ইচ্ছে করে।—তপতী তুমি কোথায়? ডাক দেন হরেনবাবু।

তপতী কাছে এসে প্রণাম করতেই তপতীর মাথায় হাত রাখেন হরেনবাবু। আর যেন একটা নিবিড় বিশ্রান্তির সুখে হরেনবাবুর চোখের পাতা নেতিয়ে পড়ে।

আর কোন কাজ নেই হরেনবাবুর। না, মনে পড়ে গিয়েছে, আরও একটা ইচ্ছার কাজ বাকি আছে।—সেই অ্যালবামটা একবার দাও তো তপতী। ভবতোষের নাতি-নাতনিগুলোকে একটু ভাল করে দেখি। সেদিন ভাল করে দেখতেই পাইনি।

চাদরের খুঁট দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে হরেনবাবু আবার যেন একটা ইচ্ছার সাড়া পেয়ে চমকে ওঠেন। —হ্যাঁ, আরও একটা ইচ্ছার কাজ বাকি আছে তপতী; এক শীট কাগজ আর একটা পেন নিয়ে এস।

—কিসের কাজ কাকাবাবু?

—পূর্ণিমার আলোর ট্রাষ্ট ডীডের ভাষার ভুলটা একটু শুধরে দিই। খসড়াটা এখনই ক'রে রাখি। আর সময় পাব কি পাব না, কোন ঠিক তো নেই।

—কাকাবাবু! কি যেন বলতে চায় তপতী।

হরেনবাবু হাসেন—আর দেরি করিয়ে দিও না, তপতী। আমি এবার মনের সুখে ভবতোষের সঙ্গে একটু গল্প করতে চাই।